কাছা কাছি পৌঁছিতে হইবে। আমার অজ্ঞানতা দেখাইতে যাইয়া আমার ঘাড়ে ত্রিকালের জ্ঞানের বোঝা চাপান হইল। রহস্য মন্দ নয়। তারপর, মানুষ যখন সর্বজ্ঞ নয়, তার জ্ঞান যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতেছে, তখন আজ যাহা অবোধ্য, কাল যে তাহা বোধগম্য হইবে না, তাহার প্রমাণ কি। দুই হাজার বৎসরে একটা কথার মীমাংসা হয় নাই বলিয়া, চিরদিনই তাহা অমীমাংসিত থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বরং দেখিতেছি, যাহা এক দিন মহা মহা পণ্ডিতের কাছে অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইয়াছিল স্কুলের বালকের কাছে আজ তাহা অতি স্বাভাবিক। আজ এই মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিকের কাছে যাহা নিতান্ত সহজবোধ্য স্বাভাবিক, সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে অতি-প্রাকৃতিকের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং চৈতন্যদেব ষড়ভূজরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এই হেতুতে যে একজন বৈষ্ণব আমাকে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন, আমি নানা কারণেই সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ, উহা যে অতি প্রাকৃতিক তাহার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উহা ভেল্কীও হইতে পারে। বাজীকরেরা তো অনেক ঘটনায় এমনই তাক্ লাগাইয়া দেয়। আমি ভেল্কীবাজীর অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহার অর্থ তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি না। সুতরাং কি স্বীকার করিব যে আমাদের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অনেক ঈশ্বর ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যদি বলা যায়, তাহার অন্যান্য কার্য্যের আলোকে তার অবতারত্ব বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ আমার বুকের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে, বাহির হইতে আমার উপর চাপাইতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, উহা যে সত্য ঘটনা, তা আমি হঠাৎ কেমন করিয়া স্বীকার করিব। ইতি-পূর্ব্বে কত ঘটনা অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা বহুদিন ঐতিহাসিক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এই তো সেদিনের কথা, এখনও লোকের মনে সন্দেহ রহিয়াছে যে, আসল নেপোলিয়নকেই সেণ্ট হেলেনায় পাঠান হইয়াছিল কি না। ইতিহাস পুরাণে এমন কত কথা আছে যাহা বস্তুতঃ সত্য নহে। যদি বলা যায়, যাহারা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল লোক। অনুপ্রাণিত মিথ্যা লিখিতে পারেন না। তাহা হইলে, অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিলেও কি বিপত্তি ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এখানেও স্মরণ করিতে হইবে। তারপর, যারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য, সত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নাই। ঐতিহাসিকগণ তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যারা ধরা পড়িয়াছেন, তা ছাড়া সে দলে আর কেহ নাই, তা বুঝিব কিরূপে? এবং তাহা যদি না বুঝিলে না চলে, তবে তাহা বুঝিবার ভারও আমারই জ্ঞানের। মানুষ আপনার ছায়ার ন্যায় আপনার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ।

ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কোন মত জ্ঞান-বিরুদ্ধ হইলে, তাহা স্ববিরোধীতা দোষে দুষ্ট হয়। সেইজন্য ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব, সকল জ্ঞানাতীত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানাতীত বলিলেও কি দোষ ঘটে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বাস্তবিক, এই দুই মতে পার্থক্য অতি কম; নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের মায়াবাদীরা বলেন যে, সংসারটা মায়া-বিজৃম্ভিত। এখানকার যা কিছু সব অজ্ঞানতা-প্রসূত। সত্য বা পারমার্থিক-তত্ত্ব এখানে

পাওয়া যাইবে না। এখানে যা কিছু করিবে, সবই তত্ত্ব-বিরোধী। প্রকৃত তত্ত্ব হ'ল, ব্রহ্ম-তত্ত্ব। তাহা সংসারের অতীত। সে তত্ত্ব না পাইলে, সংসারের অতীত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ সংসারে আছ সে তত্ত্ব পাইবে না। অর্থাৎ, যার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তার সংসার নাই, যার সংসার আছে, তার ব্রহ্মজ্ঞান নাই। এই সংসারে বেড়াইতে বেড়াইতে, যদি কেহ ঠিকরাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে যাইয়া পড়ে, তবেই তার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সে পথও রুদ্ধ। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের অতীত, লৌকিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা যে কি, তাহা না পাওয়া পর্যান্ত, বুঝিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, আমরা যখন আমাদের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের খবর রাখি না, রাখিতে পারিও না, তখন যা কিছু আমাদের এই জ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস নহে, তাহাও অসঙ্গত বা স্ববিরোধী বলিয়াই আমাদের মনে হইবে। জ্ঞানবিরুদ্ধ বা জ্ঞানাতীত তখন এক কথাই দাড়াইবে। যা এখন বুঝি না, পরে বুঝিতে পারি, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার জ্ঞানের দ্বারা কোন কালেই যার ব্যাখ্যা হইবে না, তার সঙ্গে সুতরাং কোন কালে আমার কোন সম্বন্ধের কল্পনা নিতান্তই কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

তবে, এ কথা সত্য, আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশে মানুষ যে সকল ভাব প্রাপ্ত হয়, তার সকলই যে সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধির বিচারে আয়ত্ত করে বা ভাষায় সম্যগ্ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে। কিন্তু যা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা ত হার জ্ঞান বিরুদ্ধ বা জ্ঞানের অতীত হইতে পারে না। অধ্যাত্ম বিষয় তো দূরের কথা, মানুষ তো ব্যবহারিক তত্ত্বই ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া, হয়রাণ হইয়া পড়ে। মানুষের ভাষায় দুর্ব্বলতা তো পদে পদেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন যে প্রচলিত কথা—'খাওয়া,' তা লইয়াই না মানুষ কত বিব্রত। সে ভাত খায়, তাতো সকলেই জানে। কিন্তু কাণমলা, খাবি ও ডিগবাজী খাইতেও কসুর করে না। জল, ঘোল ও মাটি একাধিক রকমে খায়। কখন কোন্ রকমে খায়, তা ভাষা নির্ণয় করিতে অসমর্থ, মনের ভাবের সাহায্য লইতে হইবে। নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিবে। স্পষ্ট নিরাকার-বাদী, আকার ইঙ্গিতে নহে, কিন্তু স্পষ্টভাবেই যখন স্বীয় ইষ্টদেবতায় মুখ, চরণ, হাত আরোপ করে, তখন কথাটা বুঝিতে ভাষাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়া, কথাটা বুঝি নাই, তা নয়। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই রূপক উপমার (analogyর) সাহায্য লয়। উপমার ব্যবহার সম্ভব হয়, জ্ঞানের পক্ষে, উপমার ও উপমেয়ের মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়া। যাঁহাকে উপমা দ্বারা বুঝাইতে যাই, তাঁহার সম্যক ধারণা না থাকিলে, উপমা খুঁজিতে যাওয়া অর্থশূন্য হইত। ভাষার দৈন্য, ভাবের ঘরের শূন্য সূচনা করে না। মানুষের অভিজ্ঞতা দর্শনিক-তত্ত্বে পরিণত হইতে সময় লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। জ্ঞান বলিতে যদি মানুষের সমগ্র প্রকৃতির সাক্ষ্য ("Human powers of insight in their completest scope"—Howison) বুঝি, তাহা হইলে জ্ঞানাতীত কথাটাই নিরর্থক হইয়া যাইবে।

শেষকথা। আমাদের দেশে অপৌরুষেয় বাণী বা আপ্তবাক্য-বাদ বোধ হয় বৈদেশিক শাস্ত্র-বাদের প্রভাবে প্রাচীন ঋষিদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে কিছু সরিয়া পড়িয়াছে। ঋষিদের শাস্ত্রবাদ—

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ।

এখানে জ্ঞানের বিষয় সমূহের মধ্যে উচ্চ নীচের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান এক। জ্ঞানের যে অংশ ব্রহ্মময়ী, তাহাই শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থ বিশেষকে আপ্তবাক্যের আধার বলা হইতেছে না। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং আমার জ্ঞানই তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র আলোক। কেন না, বেদাদি যদি তা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাও অগ্রাহ্য।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

—রামমোহন-ধৃত বৃহস্পতি বচন।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই শাস্ত্র। সত্যং শাস্ত্রম্। তাহাই কেবল সে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুতরাং অপৌরুষেয় বাণী পুরুষের অনধিগম্য তো নহেই, বরং সে সকল প্রযত্নে শঙ্কানতচিত্তে স্বীয় জ্ঞানের আলোকে, ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হইবে। এইখানেই তার বুদ্ধিবৃত্তির চরম সার্থকতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাভারত মঞ্জরী।

সভাপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—সভানির্ম্মাণ।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট যমুনা তীরে বসিয়া আছেন। এমন সময় ময়দানব আসিলেন। অর্জ্জুনকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে খাণ্ডব-দাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকার করিতে চাহি।" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "আপনি উপকার পাইয়াছেন বলিয়া প্রত্যুপকার করিতে চাহিতেছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে প্রত্যুপকার লইতে পারিনা। আপনি যে উপকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।" তথাপি কৃতজ্ঞ ময়দানব কিছু করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "তবে আপনি কৃষ্ণের কোন প্রিয়কার্য্য করুন, তাহা হইলেই আমার প্রিয় কার্য্য করা হইবে।" ময়দানব তখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন কার্য্য করিব?" কৃষ্ণ লোভ-মোহের অতীত। তাঁহার নিজের জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই।

তিনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যদি আপনি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে চান, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য মনোহর সভা নির্ম্মাণ করুন। তাহা যেন জগতে অতুলনীয় হয়।" ময়দানব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তখনই সেই সভার কল্পনা করিয়া দেখাইলেন। পরে বলিলেন, "হিমালয়ে বহু মণি কাঞ্চন ও স্ফটিক আছে। তাহা দ্বারা সভা নির্ম্মাণ করিব। এখন সে সকল আনিতে চলিলাম।" এই বলিয়া তাঁহাদের কাছে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ময়দানব একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

কৃষ্ণ আজ দ্বারকায় যাইলেন। তিনি সকলের কাছে বিদায় লইয়া স্বীয় গরুড়-ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন (১)। রাজা যুধিষ্ঠির সেই রথে উঠিয়া সারথির পার্শ্বে বসিলেন। তাহার হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি লইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই রথের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্বেত-চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভীম নকুল সহদেব ও বহু পুরবাসী কৃষ্ণের রথের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। এই রূপে সকলে দুই ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিলেন। তখন কৃষ্ণ সকলকে গৃহে গমন করিতে বলিলেন। আর কহিলেন, "আবার আসিব।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, মস্তক চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন। এখন রথ অতিদ্রুত ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পাণ্ডবেরা নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। শেষে তাহা অদৃশ্য হইলে কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে শূন্য মনে শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

যাহার মন উন্নত, সে কি উপকার পাইয়া নীরব থাকিতে পারে? প্রত্যুপকার না করিয়া স্থির হইতে পারে? উপকৃত ময়দানব শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জ্জুনকে "দেবদত্ত" নামক মহাশঙ্খ ও ভীমকে এক ভীষণ গদা প্রীতি-উপহার দিলেন। এখন তিনি সভা-নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক কার্য্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ মাসের অকাতর পরিশ্রমে সকল সমাপ্ত হইল। তখন তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যগণ-সহ দেখিতে আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইলেন। দেখিলেন—ময়দানব সে সভাস্থল পঞ্চ সহস্র হস্ত চতুষ্কোণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যস্থলে অতি সুন্দর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়াছে, তেমনি কত স্ফটিক, মণি মুক্তা ও স্বর্ণ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। তাহার গাত্রে স্বর্ণ ও বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি নির্ম্মিত বৃক্ষ লতা পাতা প্রভৃতি বহু বিধ চিত্র খোদিত রহিয়াছে।

ঐ সভাগৃহের চতুস্পার্শ্বে মনোহর উদ্যান রচিত হইয়াছে। তাহাতে শ্যামল বৃক্ষরাজি ও লতা কুঞ্জ নানাবিধ ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া চিত্তরঞ্জন করিতেছে। সেই উদ্যান মধ্যে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আবার বিবিধ বর্ণের পদ্ম ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কত জল-প্রিয় বিহঙ্গম তাহার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জল ও স্থল হইতে পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে।

১। প্রাচীনকালে ভারতের গণ্যমান্য লোকদের পতাকায় একটী একটী জন্তুর মূর্ত্তি থাকিত। কৃষ্ণের পতাকায় গড়ুর ও অর্জ্জুনের পতাকায় কপির মূর্ত্তি ছিল।

তাহার অদূরে আবার স্ফটিক নির্ম্মিত তরঙ্গযুক্ত এক কৃত্রিম সরোবর শোভা পাইতেছে। তাহাতে স্বর্ণ এবং নীল পীত লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি বিনির্ম্মিত কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারা কৃত্রিম হইলেও নিকটবর্ত্তী সরোবর স্থিত প্রকৃতির পুষ্পশোভার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মধ্যে সেই সকল মণি মুক্তার উপাদানে নির্ম্মিত হংস, বক, সারস প্রভৃতি জলচর পাখী, জীবন্ত পাখীর ন্যায় বসিয়া আছে। কত স্বর্ণ ও মণি মুক্তার মৎস্য সেই জলাশয়ে শোভা পাইতেছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক বাস্তব জলাশয়ের ভ্রম-উৎপাদন করিতেছে।

আমরা যদি দিল্লী ও আগ্রার শ্বেত মর্ম্মরের স্বপ্নময়ী সৌধশোভা না দেখিতাম, তাহার গাত্রে বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি বিনির্ম্মিত, খোদিত বৃক্ষাবলী প্রত্যক্ষ না করিতাম, তাহা হইলে এই সভার বর্ণনা কবি-কল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম। বস্তুত, একদিন ভারতের সকলই বিচিত্র, সকলই বিস্ময়-কর ছিল। প্রাচীন ভারত এত উন্নত ছিল, আর আজ আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা সে ভারতের ধারণা কল্পনা-বলেও করিতে অসমর্থ। (২)　ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

২। দিল্লী ও আগ্রার এ সকল গৃহের বর্ণনা মৎপ্রণীত 'সম্রাট আকবরে' প্রদত্ত হইয়াছে। নারদ এই সভা দেখিতে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নের ছলে অনেক উপদেশ দেন ঐ ঐ বিষয়ের অনেক কথা মহাভারতের অন্যান্য স্থানে আছে। আমরা সে সকল একত্রিত করিয়া সাজাইয়া এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাজধর্ম্মে' লিখিয়াছি।

অর্থের স্বামিত্ব ও দাসত্ব।

সংসারী মাত্রেই ভোগ্যবস্তুর প্রতি যত্নশীল। যে নয়, সে অসংসারী—অর্থাৎ কোন উচ্চতর ভোগের অধিকারী হইয়া ক্ষুদ্রতর ভোগে বীতস্পৃহ—অথবা শিক্ষা ও সংস্কারগত কোন বিশেষ কারণে তৎসম্বন্ধে যত্নহীন। ভোগ-পরায়ণ ধনী সন্তানেরা এই কারণে অপব্যয়ী হইয়া অতি শীঘ্র পথের ভিখারী হইয়া পড়ে। আর এক শ্রেণীর ধনবান আছে,—তাহারাও ধনের উপার্জ্জক নহে, উত্তরাধিকারীমাত্র,—কিন্তু সেই পিতৃধনে তাহাদের বিকট আকর্ষণ। ইহারা অল্প-প্রাণ অর্থ-দাস মাত্র, এবং পূর্ব্বোক্ত অপব্যয়িগণের বহু নিম্নে ইহাদের স্থান। তাহাদের মধ্যে বরং একটা মুক্তভাব আছে, ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। ইহারা অতি সতর্ক, বাজে খরচের পথ—এমন কি দানাদির পথও—একবারে রুদ্ধ। কারণ, কেবল প্রাণে ভয়—"আজ যদি এই অর্থরাশি আমার হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে এই অকর্ম্মণ্য 'আমি'টীর স্থান কোথায়?" আগাছাকে যেমন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ভার নিজেকেই লইতে হয়, এ সমস্ত কৃপণকেও তেমনি নিজের রক্ষাভার নিজের উপরই লইতে হইয়াছে। সে জানে, জীবনে সে এমন কিছু করে নাই, যাহাতে অপরে তাহার রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিবে। সে আরও জানে, সে এমন কিছু কর্ম্মশক্তির অধিকারী নহে যে, আজ পথে দাঁড়াইলেও কালে আবার সে ঘরবাড়ী

—মায় ঠাকুরদালান ও নাচঘর—সবই করিয়া লইতে পারিবে। কাজেই সে বিস্ময়ের দাস। অপব্যয়ীর মূঢ়তা ও অবিমৃষ্যকারিতা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁচিয়া থাকার মত ক্ষুদ্র জিনিষের জন্য সে যে নিজের ভোগ-দীপ্ত জীবনকে নিষ্প্রভ করিতে চায় না, ইহাতে তাহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় হয়। "বাঁচি ত সুখেই বাঁচিব, সুখ-শূন্য জীবনের অবসানই ভাল"—ইহাই তাহার চিন্তার গতি। কিন্তু, কৃপণ নিজেকে ও জগৎকে পদে পদে বঞ্চিত করিয়া, শুধু ভবিষ্যতের নয়, বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তায়, চির-সংকোচের জীবন যাপন করে। তাহা অপেক্ষা দুঃখের আর কি আছে? পিপীলিকা—যে একটীমাত্র নবপদক্ষেপে প্রাণত্যাগ করে—তাহারও জীবন এই কৃপণের তুল্য দুর্ব্বহ নহে। কারণ, ভগবান্ তাহাকে মানুষের মত চিন্তাশক্তি দেন নাই,—সে পরমুহূর্ত্তের জন্য শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত নহে। কৃপণকে কিন্তু সেই শঙ্কা অনবরত বুকে করিয়া থাকিতে হয়। বাঁচাই তাহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে কামনা পূর্ণ হইবার নহে, মরিতেই তাহাকে হইবে। এ মরণ কি ভয়ানক! বাঁচা ছাড়া যাহার চিন্তা নাই, নিশীথ-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াও যাহাকে কল্পিত ঘাতকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে যদি ঠিক্ জানে মরণ অপেক্ষা নিশ্চিত আর তাহার পক্ষে কিছুই নাই—তবে সে কি নৈরাশ্যের অতল সাগরে ডুবিয়া যায় না? বলিতে কি, সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছে। কারণ বাঁচাই যাহার সর্ব্বস্ব, অথচ মরণই যাহার সুবিদিত পরিণাম, তাহার জীবন মৃত্যুর নিকট ঋণ-গ্রহণ মাত্র, ঋণমাত্র, বর নহে। কুসীদজীবী সেই কৃপণও ঠিক্ জানে, এ ঋণ তাহাকে সুদ-সমেত শোধ করিতে হইবেই। আসল শোধ হইবে মরণে, আর সুদের পরিশোধ—যাহা উত্তমর্ণের নিকট আসলের অপেক্ষাও মূল্যবান, তাহার শোধ—হইবে ব্যাকুলতায়, পরপারের শূন্যতা চিন্তায়, তাহার একমাত্র সত্যবস্তুর সহিত চিরবিচ্ছেদের অসহ্য যন্ত্রণায়। অপব্যয়ী অর্থের স্বামিত্ব ভোগ করিয়া মুক্ত হয়, কৃপণ অর্থের দাসত্ব করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

গান।

(ভৈরবী)

প্রভাতের অরুণ আলোয়
কে ডেকেছে।
আমি যে আর আপন মনে
ঘরে কোণে রইতে পারিনে!
কানন-ভরা কুসুম-গন্ধে
কল-পাখীর মৃদুল ছন্দে
ঝর্ণা-ধারার বিপুল আনন্দে
কে ডেকেছে!

আমার প্রাণে রঙীন রাখী
দিয়ে, সকল হৃদয় ঢাকি
কে ডেকেছে!
(আজ) আকাশ আলো বক্ষে নিয়ে
চল্‌বো সকল বিশ্বে ধেয়ে
সেই বারতা লয়ে, প্রাণে
কে ডেকেছে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

আমরা কি চাই? (২)

অন্তরে "স্বরাজের" উপলব্ধি? না, সমাজে "স্বরাজের" প্রতিষ্ঠা?

আমরা যে "স্বরাজ" পাইবার জন্য দেশটাকে এমন করিয়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছি, সেই "স্বরাজ" কি কেবল ভিতরেই উপলব্ধি করিবার বস্তু, না বাহিরে,—আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে,—মানুষে মানুষে যে সকল সম্বন্ধ আছে সে সকল সম্বন্ধের মধ্যে এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই?

এতাবৎকাল এরূপ কোনও প্রশ্ন উঠে নাই, তোলার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এতাবৎকাল যাঁহারাই স্বরাজের কথা কহিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাঁহারাই স্বরাজ বলিতে একটা রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বুঝিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন নূতন কথা উঠিয়াছে, স্বরাজ ভিতরের বস্তু। ইহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। "ইহাতে"—এই সে দিন চিত্ত বাবু তাঁর বরিশালের বক্তৃতায় কহিয়াছেন,—"কোনও *system of government* এর কথা নাই।" চিত্ত বাবু তাঁর বরিশালের বক্তৃতায় আরও কহিয়াছেন—"স্বরাজ উপলব্ধি কর, নিজের প্রাণের মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্ট হও⋯⋯ বাহিরের সব আশ্রয় ত্যাগ কর। আমাদের একমাত্র আশ্রয় ভগবান, তাঁর স্মরণাপন্ন হও⋯ দৃঢ়তার সহিত নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াও। যুক্ত-করে ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা কর—'হে বিধাতা, আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁকে জাগ্রত কর, আমার হৃদয় নিহিত স্বর্গীয় দেশ-প্রেমকে উদ্বুদ্ধ কর, আমি তার মধ্যে ডুবে যাই'।"

যাহা অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, নিজের প্রাণের মধ্যে ধ্যান নিবিষ্ট হইয়া যাহার সাক্ষাৎ-লাভ করিতে হয়, যাহা লাভ করিতে গেলে বাহিরের সকল আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয়, আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁকে জাগ্রত করিতে হয়—সে বস্তু জীবের আত্যন্তিক অন্তরঙ্গ বস্তু। এ বস্তু বাহিরের বস্তু নহে। বাহিরের অবস্থা বা ব্যবস্থার উপরে এ বস্তু লাভ বা সম্ভোগ করা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে না। এ বস্তু লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয় সকলের রাজা—মনকে এ সকল ইন্দ্রিয় হইতে, বুদ্ধিকে মন হইতে, আর নিজের আত্মবস্তুকে বুদ্ধি হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। এ বস্তুকেই আমাদের প্রাচীন বেদান্তে মুক্তি কহিয়াছেন। আর আমাদের প্রাচীনেরা স্বরাজ শব্দ এই মুক্তির অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মুক্তিলাভ হইলে জীব স্বরাট হয়। 'স স্বরাড্ ভবতি'—ছান্দোগ্য উপনিষদে এ কথা আছে।

এই স্বরাজ-সাধনার দুইটা পথ, অথবা, একই পথেরই দুইটা বিভাগ। প্রথম বিভাগকে ব্যতিরেকী কহে; দ্বিতীয় বিভাগ,—যাহা চরমে ও পরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে,—তাহাকে অন্বয়ী বিভাগ কহা যায়। ব্যতিরেকী-পন্থার সূত্র—নেতি, নেতি সাধন,—বর্জ্জন। এই পথে বাহিরের সমুদয় বিষয় ও আশ্রয়কে "আমি নই" বলিয়া পরিহার করিতে হয়। অন্বয়ী পথের সূত্র—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ। এই চঞ্চল জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ব্রহ্মময় বা

আত্মময়। এ পথে, এই ভাবটী সাধন করিতে হয়। যাহাকে প্রথমে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করিয়াছিলাম, তাহাকেই এখন, বিবেক বৈরাগ্যাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও আত্ম শুদ্ধি হইলে পরে, আত্ম বস্তু বলিয়া অধিকার করিতে হয়। এইরূপে সাধক যখন আপনাকে সমুদয় বিশ্বের মধ্যে এবং নিখিল বিশ্বকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তখনই 'স স্বরাড় ভবতি'—তিনি স্বরাট হ'ন। শাস্ত্রে কহেন বামদেব ঋষি এইরূপ স্বরাট হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিয়া 'আমি মনু হইয়াছিলাম,' 'আমি সূর্য্য হইয়াছি' এই ভাবে বিশ্বময় নিজের আত্ম স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

অকিঞ্চন হইলেও, এ সকল কথা গুরু-শাস্ত্র মুখে শুনিয়াছি। এই স্বরাজ বস্তু যে কি,—যে স্বরাজ অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, ধ্যান নিদিধ্যাসন হইয়া যাহার সাক্ষাৎকার পাইতে হয়, যে বস্তু পাইবার জন্য জীবের মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁহাকে জাগাইতে হয় এবং তাঁহার মধ্যে ডুবিতে হয়,—সে বস্তু যে কি, ভারতের সনাতন সাধনা এবং সিদ্ধিতে তাহা জানা আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা যে স্বরাজের আন্দোলন তুলিয়াছি, যাহার জন্য ইংরাজের শাসন-যন্ত্রকে বিকল করিবার বিবিধ চেষ্টায় তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিজেদের হাত গুটাইয়া আনিবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছি, তাহা কি ছান্দোগ্য উপনিষদের স্বরাজ, না, অন্য কোনও বস্তু?

চিত্ত বাবুর বরিশালের বক্তৃতার পূর্ব্বে দেশের, অপর কোনও আধুনিক "স্বরাজ-সাধক" স্বরাজ বলিতে এই অন্তরঙ্গ বস্তু বুঝেন নাই। চিত্ত বাবু এখনও যে নিজে স্বরাজ বলিতে ছান্দোগ্য উপনিষদের স্বরাজ বুঝেন, এমন কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তাঁর বরিশালের বক্তৃতাতেই তিনি কহিয়াছেন—

> স্বরাজ মানে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানে মিলে যে নূতন জাতি গড়ে হয়ে উঠছে, এই জাতির যে যথার্থ প্রকৃতি, তার অনুকূল যা, তাই স্বরাজ।

চিত্ত বাবুর এই কথার মধ্যে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথম, ভারতে একটা নূতন জাতি গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে, দ্বিতীয়, হিন্দু আর মুসলমান মিলিত হইয়া এই নূতন জাতিটা গড়িয়া উঠিতেছে, তৃতীয়, এই গড়ন্ত নূতন জাতির একটা যথার্থ প্রকৃতি আছে। আর এই তিনটী বিষয় বুঝিলে পরে, এই নূতন জাতির প্রকৃতির অনুকূল যে স্বরাজ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

প্রশ্ন এই, চিত্ত বাবু এখানে যে স্বরাজের সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই স্বরাজ বস্তু কি ভিতরের বস্তু? ভারতের এই গড়ন্ত নূতন জাতির যথার্থ প্রকৃতি যে কি, ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিলেই কি আমাদের স্বরাজ-লাভ হইবে? প্রথম কথা এই, হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার যথার্থ প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিব কোথায়? সেও কি আমার অন্তরে? আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁহার ভিতরে? না, আর কোথাও? তারপর, হিন্দু আর মুসলমানে মিলিয়া ভারতে একটা নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার অর্থ এই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধের উপরে চিত্ত বাবুর এই নূতন জাতিটা গড়িয়া উঠিতেছে। হিন্দু মুসলমান নয়, মুসলমান হিন্দু নয়। ইহারা দুইটা পরস্পর বিভিন্ন বস্তু। দুইটী বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, একটা

সামান্য-ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। যেখানে দুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সামান্য-ধর্ম্ম না থাকে, সেখানে ইহাদের পরস্পরের কোনও সম্বন্ধের আশ্রয়ও থাকে না। সম্বন্ধ মাত্রেই একটা সামান্য-ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে। এ সকল কথা ইংরাজী শিখিয়া পাই বা না পাই, আমাদের ইংরাজী শিক্ষার দুষ্ট-সম্পর্ক-বর্জ্জিত প্রাচীন বেদান্ত দেখিয়া বুঝিয়াছি। সুতরাং, এ কথাটাকে ইংরাজী শিক্ষার আবর্জ্জনা বলিয়া চিত্ত বাবুও উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

এখন কথা এই, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা সাজাত্য বা জাতিগত সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে বা উঠিয়াছে, তাহার আশ্রয়ীভূত সামান্য ধর্ম্মটি কি? এ সামান্য ধর্ম্মটাকে কি আমরা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করি, না, বাহিরে প্রত্যক্ষ করি? আমার মনে ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া যখন মুসলমানকে দেখি, তখন তাহাকে আত্মবৎ রূপেই প্রত্যক্ষ করি। আমার মধ্যে যিনি আমার অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিয়া আমার জীবনের সাক্ষী হইয়া আছেন, যাঁহার মধ্য দিয়া আমি জগতের রূপরসাদি ভোগ করিতেছি, যিনি আমার হৃষীকেশ রূপে ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরিত করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী, তিনি মুসলমানের মধ্যে, তাহার অন্তরাত্মারূপে বাস করিয়া তাহারও জীবনকে নিয়মিত করিতেছেন। আমার অন্তরের বা ভিতরের এই অন্তর্যামী পুরুষের মধ্যে আমি মুসলমানকে মুসলমান বলিয়া দেখি না, জীবরূপেই প্রত্যক্ষ করি। এই আত্মতত্ত্বের ভূমিতে হিন্দু নাই, বৌদ্ধ নাই, খৃষ্টান নাই, স্বদেশী নাই, বিদেশী নাই; ভারতবাসী নাই, ইংরাজ নাই। এখানে আছে, কেবল জীব। এখানে জীবত্বই আমাদের সামান্য-ধর্ম্ম। এখানে ইংরাজের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা যেমন সামান্য জীব-ধর্ম্ম-বিরোধী, আমার নিজের পুত্রকন্যার মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা সেইরূপই সামান্য জীব-ধর্ম্মের বিরোধী। এখানে কোনও ভেদাভেদ নাই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা উভয়ের সামান্য-জীব-ধর্ম্মের উপরে গঠিত নহে। হিন্দুও জীব, মুসলমানও জীব, এই বলিয়া ইহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সম্বন্ধের আশ্রয় আর একটা কিছু। সে কিছুটা কি?

হিন্দু ভারতবর্ষের লোক, অর্থাৎ স্মরণাতীত কাল হইতে এই ভারত ভূমিতেই বাস করিতেছে। আর মুসলমানও সাত আট শত বৎসর ধরিয়া, এই ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষের লোক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, এক দেশে বাস করাটাই ইহাদের মধ্যে এখন একটা সামান্য-ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, ভারতবাসীত্ব-রূপ যে সামান্য-ধর্ম্ম, তাহারই উপরে এই নূতন সম্বন্ধটা গড়িয়া উঠিতেছে? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এই সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে স্বরাজ, তাহা, যে বস্তুকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, সেরূপ আধ্যাত্মিক বস্তু হয় না।

কিন্তু আমরা যে স্বরাজের কথা কহিতেছি, তাহা কি কেবল একটা ভৌগোলিক বস্তু? একই ভূভাগে পরস্পরের নিকটে প্রতিবেশীরূপে বসবাস করাতে, আমাদের উভয়ের চরিত্রে ও ব্যবহারে, চিন্তাতে ও সাধনাতে যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই কি এই নূতন জাতির যথার্থ প্রকৃতি বলিব, এবং, এই প্রকৃতির অনুকূল যাহা, তাহাকেই স্বরাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইব?

এই বাঙ্গলাদেশে হিন্দু মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেয়, মুসলমান হিন্দু দেবদেবীর নিকটে বলি লইয়া আইসে। এই যে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা উদারতা গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বস্তুটি চিত্ত বাবু যে নূতন জাতির কথা কহিতেছেন, তাহার মূল প্রকৃতির অঙ্গীভূত বটে। এইরূপ আরও দুই দশটা লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধের মূল প্রকৃতিটা অল্প বিস্তর বুঝিতে পারা যাইবে। প্রশ্ন এই, এই গুলির অনুশীলন যাহা তাহাকেই কি স্বরাজ বলিব?

তারপর, হিন্দু মুসলমানের এই সম্বন্ধের মূল প্রতিষ্ঠা কি ভৌগলিক, না আর কিছু? এরূপ কল্পনা করা ত সম্ভব যে, সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ কাবুলের আমীরের অধীনে থাকিতে পারিত, আর সমগ্র অন্ধ্র-প্রদেশও অবস্থা বিশেষে হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসনাধীনে থাকাও একেবারে অসম্ভব ছিল না। এইরূপে পশ্চিমে একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র, আর পূর্ব্বে ইহারই মতন আর একটা মুসলমান রাষ্ট্র থাকিলে, এই সকল রাষ্ট্রের মুসলমানের সঙ্গে বাঙ্গলার বা বোম্বাইয়ের, অযোধ্যা এবং প্রয়াগের, কিম্বা গুজরাটের বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে, চিত্ত বাবু যে নূতন জাতি গঠিত হইয়া উঠিতেছে বলিতেছেন, সেরূপ একটা নূতন জাতি কি গড়িয়া উঠিত? কিম্বা, এখন আমরা যেমন আফগানিস্তানের বা পারস্যের মুসলমানদিগকে আমাদের জাতির লোক বলিয়া স্বীকার করি না, সেইরূপ তখন পঞ্জাবের বা অন্ধ্রের মুসলমানদিগকেও নিজেদের লোক বলিয়া জানিতাম না। সুতরাং, হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া ভারতে যে নূতনজাতি গড়িয়া উঠিতেছে, কেবল একদেশে বাস করাতেই এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কেবল এক দেশে বাস করি বলিয়া নয়, কিন্তু আমরা এক রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে আছি, একই রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের ধন, মান, প্রাণ রক্ষিত এবং আমাদের পরস্পরের ব্যবহারিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া, হিন্দু-মুসলমানের এই নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং, এই জাতির প্রতিষ্ঠা অন্তরে নহে, বাহিরে, ধর্ম্ম-সাধনে নহে, রাষ্ট্রীয়-শাসনে। আর এই নূতন জাতির স্বারাজ্য অন্তরে উপলব্ধি করিবার বস্তু নহে কেবল ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া এ বস্তুলাভ হইতে পারে না। এই বস্তুকে সমাজে, রাষ্ট্রীয় শাসনে, আমাদের জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই স্বরাজ কেবল ভিতরের কথা নয়, ভিতরে ইহার জন্য সংকল্প জাগাইতে হইবে, সত্য। কিন্তু, বস্তুলাভ হইবে বাহিরে, ভিতরে নয়। এ কথাটা বুঝিলে, স্বরাজটা system of administration নয়, এরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শঙ্খ ।

[গাথা]

নন্দিতা নীল সিন্ধু-মাতার
উজলি শীতল অঙ্ক,
উর্ম্মি-মথিত উছল বক্ষে,
গোপন হিয়ার সুরভি কক্ষে,
সার্থক কোন্ সাধনা লক্ষ্যে
লালিত তুমি, হে শঙ্খ ।

ত্যজি অতলের সুশীতল গেহ,
মাতৃ-মমতা বঞ্চিত স্নেহ,
লইয়া শুভ্র কঙ্কাল দেহ
তোমার সমুত্থান ।
মহা-মহর্ষি দধীচীর মত,
নীরবে সাধিলে লোক-হিত-ব্রত,
জীবনে মরণে হয়ে সংহত
পরাণ করিলে দান ।

ছাড়িয়া কোমল জননীর কোল,
ধরায় ছড়ালে সুধা-হিল্লোল,
স্নিগ্ধ তীব্র গম্ভীর রোল,
বাজিল গগন গায় ,
মধুর ধ্বনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
মঙ্গল নাচে জীমূত মন্দ্রে,
গ্রহ-তারা আর তপন-চন্দ্রে
মুগ্ধ নয়নে চায় ।

নব স্বরলোক করিয়া সৃষ্টি,
ভূতলে ঢালিলে আশীষ-বৃষ্টি,
কোন্ স্বপনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি
বুলাইল স্নেহ-কর ।
সুধা-কণ্ঠের মঞ্জুল রবে,
মোহিত মগন বিশ্ব-মানবে,
বিমল শান্তি-পীযুষ-আসবে
মত্ত হে চরাচর ।

শুভ মঙ্গল শোভন-কর্ম্মে,
অশুভ-নাশন পূজন-ধর্ম্মে,
বাজে তব রাগ সকল মর্ম্মে,
সম-ভাবে সুখে দুখে ,
তরুণ অরুণে করুণ নগরে,
তব গুঞ্জন গগনে বিহরে,
থমকিয়া উষা চমকি শিহরে,
লুকায় রবির বুকে ।

প্রভাত কাকলি-ধ্বনির লগনে,
বাল-রবি হাসে উদয় গগনে,
জাগতি ধরা বন্ধ মগনে
গাহে জীবনের গান ,
মধ্য দিনের তপ্ত তপনে,
রক্ত রবির আঁখির দাহনে,
তব ওঁ কার মন্দ্র বচনে
বাজে মঙ্গল তান ।

দিনকর যবে মরণের শ্বাসে,
দিবা অবসানে ম্লান মুখে হাসে,
সম্ভাষো তারে গম্ভীর ভাষে
তুমি হে বৈতালিক !
সন্ধ্যা বধূর আবাহন-রাগে,
সান্ধ্য গগনে ধ্বনিছ সোহাগে,
ক্লান্তি-কুহেলা ক্ষান্তির যাগে
তুমি মহা-ঋত্বিক ।

তব ফুৎকারে আঁধার বিনাশে,
নিশীথে আলোক-অনল বিকাশে,
সে অনলে শশী-তারকারা হাসে
পরি কৌমুদী-মালা ;
তটিনীর বুকে পাদপ-নিকরে,
দেবালয়ে পথে সৌধ-শিখরে,

পুলক-প্লাবিত জোছনা ঠিকরে
স্বরগ-স্বপন ঢালা।

শুনিয়াছ তুমি, উদার মহান্—
মহা-সাগরের কল্লোল-গান,
সে সুগম্ভীর ভৈরব তান
প্রাণের পরতে জাগে,
সিন্ধুগামিনী নদীর ধাবণ,
শিখায়েছে তারা কত কলস্বন,
কালের শ্মশান মৃত ও ভীষণ
হিন্দোলে সুর-রাগে।

মন্দিরে তুমি আরতি সঙ্গ,
উৎসব-দিনে উল্লাস রঙ্গ,
উদ্বাহে উমা-বরের সঙ্গ
তব মঙ্গল ধ্বনি,
তোমার আরাবে যোদ্ধ-পরাণ,
রঙ্গের নাচে বহিছে তুফান,
পিধান-বদ্ধ বদ্ধ কৃপাণ
নাচে মৃদু ঝনঝনি।

তোমারে বাজায়ে মদন-মোহন,
ছাড়িল ললিত মুরলী-গাহন,
বিরল গোপীর চঞ্চল চাহন,—
পিরীতির রস গীত,
শঙ্খ হে, তব হুঙ্কার রবে,
ভারত-বক্ষে সাজে কৌরবে,
ক্ষত্র-শোণিত-মহা-উৎসবে
তুমি ছিলে পুরোহিত।

হিন্দোলে যবে বাসুকীর শির,
ঘন কম্পনে নাচে ধরা নীর,
তব ভৈরব নিনাদ গভীর
সঘনে দকারি ডাকে,
নিদাঘ-তাপের প্রদাহ যেমন,
তেমনি সে স্বর দহে তনু মন,
কাঁপায়ে ভূধর কান্তার বন,
গগণে নাচিতে থাকে।

ভেদিয়া যখন মেঘ-আবরণ,
ঠিকরি আকাশে বিজলী-বরণ,
ভীষণ দৈত্য করি গরজন
ভূতলে নামিয়া আসে,
তান ব্যাপিয়া নিখিল ভুবনে।
তব নাদ বাজে ভবনে ভবনে,
বসিয়া রুদ্ধ দ্বার বাতায়নে
কম্পিত সবে ত্রাসে।

উৎসব মাঝে বন্ধুর দল,
গহ-প্রাঙ্গণে করে কোলাহল,
দুঃখ-দিনের চক্ষের জল,—
কেহ নয় তার ভাগী,
তুমি জ্বালাইয়া মঙ্গল বাতি,
শুভদিনে সুখে কর মাতামাতি,
নীরবে কাটাও সুদীপ বাতি
রোগের শিথানে জাগি।

ধন্য হে তুমি সুধীর সুজন,
অম্বুনিধির এক চেরা ধন,
যখন পেয়েছ নব যৌবন—
কোমল করুণ প্রাণ;
নবীনার নব সঙ্গ-সরসে,
লালসা-ছুপ্ত অধর পরশে,
বাজাও রাগিনী ললিত হরষে,
উছলে পুলক-বান।

চন্দ্রের চারু অমল জোছনা,
যে নারীর পদ-নখর-তুলনা,
তুমি হে তাহার গ্রীবার কামনা—
কম্বু তোমার নাম;
সার্থক তব নন্দিত স্বরে,
নন্দন নাচে প্রতি ঘরে ঘরে,

সকল বেদনা গুমরিয়া কবে
　　মঙ্গলে বিশ্রাম।

রমনী অধরে পাতিয়া আসন,
গুঞ্জরি কর প্রণয়-শাসন,
সোহাগ জড়িত রাখীর বাঁধন
　　বেঁধেছ সতীর করে,
যে ভবনে তুমি রয়েছ অচলে,
চঞ্চলা সেথা আছে অবিচলে,
জনার্দনের চারু করতলে
　　শোভিছ পুলক ভরে।

কোটি-অব্দ্ দ কবি পরাভব,
তোমার সংখ্যা জাগে অভিনব,
অমল তোমার বিত্ত-বিভব,
　　উঠেছে উদধি ছাপি,
তাই কি লক্ষ্মী পদ্মের নীরে—
বিছায়ে চরণ তোমার শরীরে,
ভক্ত মানবে ডাকিছে সুধীরে
　　হাতে লয়ে হেম ঝাঁপি?

জীবন প্রভাতে মেলিয়া নয়ান,
শুনিনু প্রথম তব [illegible]
শিশির সিক্ত কুসুম সমান
　　যে দিন পড়িল হিয়া,
যৌবনে কোন্ মধুর নিশীতে,
তব মঙ্গল শঙ্খ সঙ্গীতে,
বাঁধিলা আমারে প্রেম শৃঙ্খলিতে
　　প্রাণের পরাণ প্রিয়া।

আজি মরণের কূলে দাঁড়াইয়া,
উৎসুক আমি রয়েছি চাহিয়া,
জীবন-বীণাটি উঠিবে গাহিয়া
　　তোমার রাগিনী কবে?
শেষ খেয়া যবে লইয়া আমায়,
নীরবে নাচিবে অকূল সীমায়,
শ্রান্ত পরাণ যেন গো ঘুমায়
　　তোমার মহান্ রবে।

—দরবেশ।

দুই দিক।

১ম ব্যক্তি। কলকারখানা গুলা বসিয়া গেলে বাঁচা যায়, নতুবা অন্যভাবেই সকলে মারা পড়িবে।

২য় ব্যক্তি। আমার কিন্তু কলকারখানায় তত শ্রদ্ধা নাই। তাহাতে ভারতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব নষ্ট করিবে।

১ম। অন্য ভাবেও আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই।

২য়। সে কথার বিচার পরে হইবে, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বাঁচা যে মরণেরই নামান্তর।

১ম। দেহটা ত থাকিবে, হাড় থাকিলে 'মাস' পরে আপনিই আসিবে।

২য়। যদি 'মাসের' অনুকূল মালমসলা প্রস্তুত থাকে। কলকারখানা মুখরিত সভ্যতার মধ্যে ভারতীয় শান্তভাবের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে কি?

১ম। না হয়, নূতনই একটা কিছু হইল, তাহাতেই বা দোষ কি?

২য়। নূতনত্ব লইয়াই ত জীবনের গতি, তাহা ত আসিবেই। কিন্তু নূতনের গ্রহণ আর পুরাতনের বিসর্জন এক কথা নহে; পুরাতনেরই ভিত্তির উপর নূতনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১ম। নূতনের উপরই না হয় নূতনের প্রতিষ্ঠা হইল; দোষ কি?

২য়। প্রথম দোষ, অপব্যয়; পুরাতনকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে চাহিলে, প্রকৃতির এতদিনের পরিশ্রমকে অস্বীকার করিতে হয়। আর এক দোষ, অবিমৃষ্যকারিতা। বিনাদোষে বর্জ্জন করার মধ্যে অপরাধও আছে। সে অপরাধ সীতা-বর্জ্জনেই সীমাবদ্ধ করিলে চলিবে না; সভ্যতা-বর্জ্জন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

১ম। বর্জ্জন করিলেই যদি পুরাতন বিলুপ্ত হয়, তবে তাহার বিলুপ্ত হওয়াই উচিত।

২য়। সে কথা সত্য। কিন্তু জানকীকে বনবাসে পাঠাইয়া ঐ যুক্তির আশ্রয় লইলে কি রামচন্দ্রের সাফাই হয়? যাহার জোর আছে সে বাঁচুক, যাহার নাই সে মরুক—এ বলিলে ত অনেক কাজ কমিয়া যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বও কমে,—হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই-ই। পুরাতন সভ্যতাটা পারে ত অসহায় অবস্থাতেই সংগ্রামে জয়ী হউক, নয় ত মরুক—এরূপ কথা না যুক্তি-সঙ্গত, না ধর্ম্ম-সঙ্গত।

১ম। কিন্তু পুরাতন যে মরিতেছে, তাহা বাঁচাইয়া রাখা যে অসম্ভব।

২য়। গ্রীস্ মরিয়া আবার নূতন ইউরোপের ঘাড়ে চাপিয়াছে,—মানব-চক্ষুর অন্তরালে তাহার ভিতরে প্রাণ লুক্কায়িত ছিল। ভারতেরও যদি প্রাণ থাকে, ত' আবার কোন নূতন সভ্যতার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। এই হিসাবে সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে,—কিন্তু ভারত যে আমাদের? 'মরিতেছে' দেখিয়া ঔদাস্য-প্রকাশ কি আত্মীয়ের কাজ? হয় ত "বাঁচিবে না" ইহাই ঠিক্,—কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কি ভারত সন্তানের কর্ত্তব্য নহে? সে কর্ত্তব্য করা হইয়াছে কি?

১ম। সে কর্ত্তব্য কাহার?—যে ভারতকে বুঝিয়াছে তাহারই।

২য়। আর যে সুযোগ থাকিতেও বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, সে বুঝি আরাম-ভোগের অধিকারী? রেহাই কাহারই নাই, কাজ সকলকেই করিতে হইবে। এসব ক্ষেত্রে নেল্‌সনের সেই মহাবাক্য স্মরণীয়—England expects everyone to do his duty। সৈন্য সেনাপতির ভেদ নাই, ক্ষুদ্র বৃহতের ভেদ নাই, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ নাই, শক্তাশক্তের ভেদ নাই, প্রত্যেকেই আসুক মার সেবা করুক। মা বাঁচিবেন। আর মরেন ত সুখী হইয়াই মরিবেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা মরিবে তাহারাও ধন্য হইবে।

১ম। কিন্তু উপায় কই? ধরুন, আমার ভারত-সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব, কোথায় ও কিরূপে তাহার পূরণ হইবে?

২য়। কেবল 'ধরুন' এর উপর অতটা উত্তর দেওয়া যায় না। জ্ঞানাভাবটা যদি সত্য হয়, তাহার দূরীকরণ যদি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে পন্থাও নিশ্চয়ই আছে।

১ম। সেই পন্থার কথাই জিজ্ঞাস্য।

২য়। মনে করুন, এই ভারতীয় সাহিত্য।

১ম। এ সাহিত্য ত অনেকেই পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, কই তাঁহাদিগকে ত বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয় না।

২য়। তাঁহারা সাহিত্যের রসে আপনাদিগকে সিক্ত না করিয়া আপনাদের রসে সাহিত্যকে তিক্ত করিয়া থাকিবেন। আর, পনর আনা ক্ষেত্রে, তাহাই ঘটে। Open mind রাখা সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্যই শয়তান ধর্মগ্রন্থে নিজ-সমর্থন খুঁজিয়া পায়. ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অসভ্য-ভারতে polyandry দেখিতে পান, সর্ব্বভুক-পণ্ডিত বেদে গো-হত্যার বিধান-দর্শনে পুলকিত হন, আর বঙ্কিম-যুগের সেই নীতি-পাঠ-কুশল ছাত্রটী, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"র দোহাই দিয়া, মাঘের শীতে পরের স্নানে নিজের স্নান ও নিজের আহারে পরের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিশ্চয় করিয়া, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

১ম। কিন্তু নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ঠেকাইয়া রাখা কি সম্ভব ?

২য়। জ্ঞানের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাহা যে প্রয়োজন। এই দেখুন না, যন্ত্র-শিল্প। সে জন্য বিলাতী বই ও চিন্তা ত চাই-ই, তা ছাড়া, বিলাতী পোষাকটি পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া চলে না। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকও প্রয়োজন।

১ম। যদি না পাওয়া যায় ?

২য়। একলব্যের মত সাধনশীল হইলে, মৃন্ময় শিক্ষকেও চলে, আর শিক্ষা-প্রয়াস অভিমান-প্রসূত না হইলে, জ্ঞানলাভও সহজ হয়।

১ম। অধ্যবসায়ের মূলে কিন্তু অভিমান থাকেই, একলব্যেরও ছিল।

২য়। একলব্যের যে অভিমান, তাহার প্রকৃত নাম নিষ্ঠা, তাহা অহঙ্কার নহে। হইলে, দ্রোণ-মূর্ত্তি কখনই তাহার উপাস্য হইতে পারিত না।

১ম। নিষ্ঠা ও সদগুরু-সম্পদের অভাবে কি বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে ?

২য়। কাল-প্রতীক্ষা আবশ্যক।

১ম। তাহা ত' আলস্য-চর্চ্চার নামান্তর।

২য়। কাল-প্রতীক্ষা যে আলস্যে সময় নষ্ট করা নহে, গত যুদ্ধে ইংরাজ তাহা বিশেষভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালকে প্রসন্ন করিতে হয়, আপনার দোষ ত্রুটী যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া লইতে হয়। সুপ্ত সিংহের মুখে কোন দিনই আপনা হইতে মৃগ আসিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু, গুপ্ত সিংহ আর সুপ্ত সিংহ এক নয়। হাপাহাঁপি কে কাজ বলে না—অনেক সময় তাহা অকাজ। আর, তাহার অভাবকেও আলস্য বলে না। বিরলে, শান্তভাবে, করিবার কাজ বাস্তবিকই অনেক আছে।

১ম। সাহিত্য-চর্চ্চার কাল-প্রতীক্ষা কিরূপ ?

২য়। বাহিরে সংশিক্ষকের সন্ধান ও ভিতরে আপনার অকিঞ্চনতা স্মরণ। তাহাতে অহঙ্কারের মালিন্য ঘুচে, এবং জ্ঞানের দেবতা নিজেই আসেন বা কোন সংশিক্ষকের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেন।

১ম। অকিঞ্চনত্ব-বাদ স্বামীজীর শিক্ষার বিরোধী।

২য়। তিনি বলেন—"বীর হও"। তাঁহার গুরুদেব বলেন—"মায়ের কাছে কাঁদো"। গুরুশিষ্যে এ বিরোধ কি সম্ভবপর ? সমন্বয় আছে—পাত্র-বিচারে। যাহারা সত্যই অকিঞ্চন, অসুচিকীর্ষ, দুর্ব্বল—তাহাদিগকেই তিনি মনুষ্যত্বের গৌরব ও অধিকার গ্রহণে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু

যাহারা পৌরুষশালী তাঁহাদের পন্থা—ত্যাগ ও আত্ম-বিলয়। বিনয়, গুণের ভূষণ-মাত্র নয়,—আশ্রয়।

১ম। না হয়, কাঁদাকাটি করিয়া জ্ঞানলাভ বা গুরুলাভ হইল, কিন্তু মাঝের সময়টা যে দেশের পক্ষে বৃথায় গেল।

২য়। সে চিন্তা আমার নহে। বিশ্বের ভার বিশ্বেশ্বরের। আমার উপর ভার আমার নিজ সামর্থ্যের উপযুক্ত সামান্য কিছু করিয়া তোলা। তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। জাহাজের খবরে আমার প্রয়োজন?

১ম। কাজের সুবিধা হয়।

২য়। কল্পনার মাদকতায় কর্ম্মের দিকে উত্তেজনা আইসে, কিন্তু, অবসাদ কৃত্রিম উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আর না হয় মনেই ধরা গেল যে, নিজের দায়িত্বকে খুব বিরাট্ কল্পনা করিয়া, সত্য সত্যই অনেকটা কাজ শেষ করা হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অভাবে বিশ্বের কোন্ পরমাণুটী বিনষ্ট হইত?

১ম। এই অকিঞ্চনতা বোধ লইয়া লোকে কাজ করিতে যাইবে কেন?

২য়। জগদুদ্ধারের কমে আর কোন মতেই চলিবে না? তাহা হইলে, অবস্থা সাংঘাতিক। হ্রদের জলে লাফালাফির সময় শফরীকে ভাবিতেই হইবে, সে হ্রদটীকেই কৃতার্থ করিতেছে? নিজের তৃপ্তি কি যথেষ্ট নহে? উদ্বুদ্ধ জ্ঞান, ব্যথিত প্রেম ও উদ্যত শক্তির পরিতৃপ্তিতে কি প্রাণ পূরে না? অথচ, ভিতরের এই অদম্য কর্ম্ম-প্রেরণায় জগৎ সংসার চঞ্চল, একটী পরমাণু পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। ইহাই বিশ্বের কর্ম্মানন্দ। এ আনন্দ-লহরীর মধ্যে, কোন্ দুর্ভাগা ইচ্ছা করিয়া বসিয়া থাকিবে?

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

উৎসর্গিতা।

ভিক্ষুণী মহামায়া—
ভিক্ষা মাগেন, বুদ্ধ-করুণা লভিয়াছে যেন কায়া।
যেথা ক্রন্দন হাহাকার, যেথা যেথায় ব্যথিত প্রাণ,
সেখানে তাঁহার আকুল মর্ম্ম করিতেছে মায়া দান।
যৌবনে শোভে দেহ,
রূপের মতন অতুল কান্তি অন্তরে ভরা স্নেহ।
স্বর্গের যেন মূর্ত্ত-মাধুরী এসেছে ভুবনে নেমে,
জীবন লভেছে বিধাতার যেন অপার উছল প্রেমে
ধনী সে রতন দাস—
লম্পট যুবা, পাশব-আচারী, নগরবাসীর ত্রাস।

মহামায়া যবে করেন ভিক্ষা, কহিল তাঁহারে কামা ,—
"ভাণ্ডার মম উজাড় করিয়া তোমারে সঁপিব আমি।
বিনিময়ে চাই পরাণ-পাগল ওই তব দেহ ছবি ,
ভিক্ষা লওগো, ঢেলে দিব আজি, আমার রত্ন সবি।"
ভিক্ষুণী ঘৃণা ভরে,
চলিলেন পুনঃ অপর দুয়ারে, বিন্দু-কৃপার তরে।
চকিতে চিত্তে উঠিল দ্বন্দ্ব—কেন না নিলাম দান ?
বিশ্বের কাছে নিঃশেষ করি সঁপেছি ত মন প্রাণ।
মিথ্যা তাহা যে, মিথ্যা সকলি, ছলনা সকলি মোর,
নিজেরে তেমনি রেখেছি পূর্ণ, সত্যের কাছে চোর।
আমার মাংস বিনিময়ে যদি ক্ষুধিত অন্ন পায় ,
এ দেহ পিণ্ড নরকে যাউক ক্ষতি কিছু নাহি তায়।
বিশ্বের সুখে আমার শান্তি, সেবাই পুণ্য মম।
বিসর্জ্জন আজ ধর্ম্ম আমার, নির্ব্বান শ্রেষ্ঠতম।

* * *

কহিল রতন দাস—
"আমার দুয়ারে, ওগো ভিক্ষুণী , কি তব আবার আশ ?"
ক'ন মহামায়া—"দিব দেহ আমি, দাও তব সব ধন।
তৃপ্ত হউক শ্রান্ত কাতর ক্ষুধিত-ব্যথিত জন।"
মুগ্ধ রতন দাস।
ভিক্ষুণী পদে লুটিয়া পড়ি কহিল কাতর ভাষ,—
"যে স্নেহে জননী ভীষণ নরক অমরা তোমার কাছে—
জননী আমার, সন্তান তব সে সুধা আজিকে যাচে।"
রতন দাসের সম্পদ সব দুঃখী দীনের ধন,
ভিক্ষুণী সাথে ভিক্ষু রতন সেবিছে জগৎ জন।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

স্মৃতির স্মুরভি (১)।

সংসারের দাব দাহে শান্তির স্বপন
স্মৃতির সুরভি এযে অর্ঘ্য নিবেদন।

মহাকবি নবীনচন্দ্রের "আমার জীবন" প্রথম ভাগ যেদিন উপহার পাইলাম, সেদিনই বিকালে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার প্রিয় নিকেতন "লক্ষ্মী-ভিলায়" গেলাম। তিনি তখন একাকী সম্মুখস্থ কক্ষে বসিয়াছিলেন। আমাকে সস্নেহে তাঁহার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "তোমায় 'আমার জীবন' পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছ। বহিখানি পড়িয়াছ কি ? কেমন লাগিল ?" আমি বলিলাম, "আপনার 'আমার জীবন' পাইয়াছি। উহা আমার কাছে

এত ভাল লাগিয়াছে যে, আমি ইতিমধ্যেই আগাগোড়া পড়িয়া শেষ করিয়াছি। বহিখানির ভাষা ও রচনা-প্রণালী এত সরস ও চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে যে. পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন উপন্যাস পড়িতেছি—যেন আপনার কাছে বসিয়া আপনার মুখে আপনার জীবনের কথা শুনিতেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ 'জীবন' আপনার উপযুক্ত হয় নাই; ইহা সাধারণের কাছে আপনাকে খাটো করিয়া দিবে। বহির মধ্যে 'ষষ্ঠী মাহাত্ম্য', আপনার পাঁউরুটি খাইবার জন্য ব্রাহ্ম হইবার কথা, বিদ্যুৎলতার কথা প্রভৃতি না থাকাই উচিত ছিল।" তিনি একমনে আমার কথা শুনিতেছিলেন, আমি নীরব হইবামাত্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ জীবেন্! তোমরা আমার জীবনকে যত বড় মনে কর, বাস্তবিক তাহা ততবড় নয়, আমার জীবন 'খেলো জীবন'। সে জন্যই আমি তাহা খেলো' ভাবে আঁকিয়াছি।"—আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, লোকে যাহাকে দাম্ভিক বলে, এ কি সেই দাম্ভিক নবীনচন্দ্রের কথা? তাঁহার গভীর আত্মনিষ্ঠাই কি লোকের চক্ষে আত্মম্ভরিতারূপে প্রতীয়মান হইয়াছে?

* * *

পুনরায়, কিছুদিন পরে নবীনচন্দ্রের কাছে গিয়াছি। সে দিন দেখিলাম, "লক্ষ্মী ভিলার" একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি শুইয়া আছেন, দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে কোন অচির-মৃতা বন্ধু-পত্নীর জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার সেই আক্ষেপ বেশী কিছু নয়—শুধু একটী কথাই তিনি বার বার বলিতেছেন,—"হা, গোপী ঘোষের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, তিনি কি চমৎকারই রান্না করিতে পারিতেন!" তাঁহার এ আক্ষেপ আমাদের নিকটে হাসির মতই শোনায়, কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপেই ডুবিয়া গিয়াছেন, সংসারের আর কিছুর সঙ্গে তাঁহার যেন কোন সম্পর্ক নাই। তিনি অন্যদিন আমাকে দেখিলে কত আদরের সহিত তাঁহার নিকটে বসাইতেন, কত গল্প করিতেন, আজ যে আমি দাড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও তাহার নাই। আমি নিজ হইতে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে কত ভাবে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি যেন আমার একটা কথাও শুনিতে পাইলেন না—একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সেই আক্ষেপ বাণীর বিরাম হইল না। অশ্রুধারাও থামিল না। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা তাঁহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে প্রবোধ দিবার প্রয়াসে নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।—নবীনচন্দ্রের এমনি ধারা অপূর্ব্ব ভাব-তন্ময়তার তুলনা নাই। এরূপ অতুলনীয় ভাব-রাজ্যের অতল তলে ডুবিয়াই তিনি একদিন "প্রভাসে" তাঁহার মানস-নন্দিনী শৈলজার মুখ দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পার্থ পুত্র, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার।
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।

একদিন প্রাতে আমার "সাধনা-কুঞ্জে" বসিয়া কি একটা কবিতা লিখিতেছি, এমন সময় তিব্বত-পর্য্যটক শরচ্চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যাইত—তাঁহার প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। সেদিনও মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমাকে বলিলেন, "শীঘ্র কাগজ কলম দাও, একটা সঙ্গীত-সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।" তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান সঙ্গীত-শাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তখনই কল্পিত "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠান পত্র, নিয়মাবলী প্রভৃতি প্রস্তত হইল। শরৎ বাবু নিজে ইহার সভাপতি হইলেন ও আমরা কেহ কেহ সহযোগী সভাপতি, সম্পাদক, ইত্যাদি হইলাম। আমাদের বিস্তৃত বৈঠকখানা কক্ষই "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উল্লেখ বাহুল্য, কার্য্যতঃ কয়েক তা কাগজের সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কি অদম্য কম্যোৎসাহ! "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" ব্যাপার শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "জীবেন্! আজ রাত্রে আমি তোমাদের এখানে খাব। আর এই যে আমার সঙ্গে বামনটী দেখিতেছ—যিনি আমার "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" বহি অনুবাদের সহকারী,—তাঁহাকেও দুই একখানি লুচি সেই সঙ্গে ফেলিয়া দিও।" ইহা বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন—আমরাও তাঁহার সেই হাসিতে যোগ দিলাম। তিব্বত-গৌরব-হারী, বিশ্ববিখ্যাত, তীক্ষ্ণধী শরচ্চন্দ্রের একি শিশুর মত বিচিত্র সরলতা! এরূপ অকপট সরলতা ও উদারতা যে ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইয়া আসিতেছে।

* * *

এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই শরচ্চন্দ্র আবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বদিন "চট্টগ্রাম-সাহিত্য-পরিষদের" এক অধিবেশন হইয়াছিল। আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, স্থানীয় কলেজের জনৈক অধ্যাপক এ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং সভান্তে শরৎবাবু, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া, তাঁহার কোন কোন অসঙ্গত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। আমি শরৎ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া তাঁহাকে এরূপভাবে অপদস্থ করিলেন কেন? ইহা কি সভার নিয়ম-বহির্ভূত নহে? তৎক্ষণাৎ তিনি সজোরে বলিলেন, "না, ইহা ঠিকই হইয়াছে। তুমি 'নোট' করিয়া রাখ, সভাপতি যদি তাঁহার শেষ অভিভাষণে কোন অন্যায় কথা বলেন, তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার সময় উহার তীব্র-প্রতিবাদ করিবে। সভাক্ষেত্রে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিবার আমাদের আর যে সুযোগ নাই।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "জীবেন্, তামাসা নয়। তুমি আমার এ কথাগুলি 'নোট' করিয়া রাখ।"

* * * *

চট্টগ্রামে "বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের" ষষ্ঠ অধিবেশন আগত-প্রায়। আমি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব করিলাম, স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। কেন না, মহাকবি নবীনচন্দ্রের

পরে তিনিই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। আমাদের কার্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এ সম্বন্ধে উপস্থিত প্রায় কাহারও তেমন মতভেদ দেখা গেল না। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। রাত দশটার সময়, কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা দয়া করিয়া ইতি-পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে আর কখনও পদধূলি দেন নাই। ব্যাপার কি? তাঁহারা সকলে একবাক্যে আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমি যেন নবীনবাবুর সভাপতি হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। তাঁহার অপরাধ? তাঁহার অগ্রজ শরচ্চন্দ্র কোথায় কায়স্থদের গালাগালি দিয়াছেন। আমি কায়স্থ হইয়া এরূপ প্রস্তাব করা আমার পক্ষে ঠিক নয়। আমি নাকি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিলে, আমার ব্যক্তিগত প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য, তাঁহাদের কাহারও নাই। আমার সমস্ত অন্তর একবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "ইহা তো আপনাদের বৈদ্য বা কায়স্থের সভা নহে। এখানে জাতি বিচার কেন? বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরকাল যোগ্যব্যক্তির সম্মান হওয়াই উচিত। আর নবীনবাবু তো আপনাদের গাল দেন নাই, তাঁহার অগ্রজের ত্রুটিতে আমরা কেন তাঁহাকে দোষী করিব? যাহা হউক, আমি কাল নিজে নবীন-বাবুর কাছে যাইব। তিনি যদি আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকৃত হন, তবে আমি কিছুতেই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিব না।" তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে না পারিয়া কতকটা নিরাশ হইয়া ফিরিলেন।

তার পরদিন বিকালে আমি কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রের "দেব-পাহাড়ে" তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে সযত্নে তাঁহার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আমি জানি, কেন আজ আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন। যখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে, তখন আমি আর আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে ইচ্ছা করি না। আপনি আর এ বিষয়ে জেদ্ করিবেন না। আমার দেশের কাজ আমি পশ্চাতে থাকিয়াই করিব।" আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার এ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। এই প্রবল আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসা-যুগে তাঁহার এবম্বিধ আত্ম-গোপনেচ্ছা আমাকে বাস্তবিকই মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাবনত করিল। এ ক্ষুদ্রতার রাজ্যে যিনি যত বড়, তিনিই বুঝি তত নিজকে এমনি লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসেন!

* * *

আর একদিন আমি ও সাহিত্য-শাস্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ, কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার "দেব-পাহাড়ে" গিয়াছি। তিনি তখন পারিবারিক নানা ঝঞ্ঝাটে একান্ত উত্যক্ত হইয়া সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক একরূপ ছাড়িয়া নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে নিভৃত "দেব-পাহাড়ে" তাঁহার বিধবা কন্যাটীকে লইয়া থাকিতেন। আমরা যখন "দেব-পাহাড়ে" উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা-সমাগত-প্রায়, "দেব-পাহাড়ের" সমুচ্চ শিখর হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু তখন আমাদের তাহা দেখিবার অবসর ছিল না, "দেব-পাহাড়ে" যে দেব-চরিত্র নবীনচন্দ্র ঋষির মত নির্জ্জন জীবন

যাপন করিতেছিলেন, আমরা তাঁহারই পবিত্র আশীর্ব্বাদ লাভের আশায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন তাঁহার সম্পাদিত "প্রভাত" পত্রের জন্য মহাকবি ভারবি-রচিত "কিরাতার্জ্জুন" কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। আমাদিগকে তাহার কোন কোন অংশ পড়িয়া শুনাইলেন। মূলের লক্ষিত ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাঁহার মত সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে এমন রতিত্ব আর কেহই প্রদর্শন করেন নাই। সেদিন তাঁহার পঠিত কবিতার দুইটী পংক্তি এখনও মনে পড়ে—

"মহতের সংসর্গেও জনমে সুফল,
ঘটে যদি দেবে কভু তাহাও মঙ্গল।"

সে সময়ে মনে হইতেছিল, আমরাও বুঝি আজ তাঁহার সংসর্গে এমনি মঙ্গলের অধিকারী হইয়াছি। কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার কথা আসিল। দেখিলাম, তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতারই সমধিক পক্ষপাতী। যাহা হউক, রাত্রি আসন্ন দেখিয়া আমরা সে দিনকার মত বিদায় লইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু। আর একটু বসুন। আমি একটু ভিতর হইতে আসি।" অল্পক্ষণ পরেই তিনি দুইখানি ক্ষুদ্র রেকাবীতে দুইটী সন্দেশ লইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরও দুই গ্লাশ জল লইয়া আসিল। নবীনবাবু বলিলেন, 'বাজার বহু দূরে—ঘরে আমার মেয়ের তৈরী যে সামান্য মিষ্টি ছিল, তাহাই আপনাদের জন্য আনিয়াছি, আপনারা একটু মিষ্টিমুখ করুন। আর "দেব-পাহাড়ে" জল তোলা কষ্টকর বলিয়া, আমি পান করিবার জন্য পাকা চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়াছি, দেখুন, কি চমৎকার।"—এমন অনাবিল স্নেহাদর এ জীবনে আর কি পাওয়া যাইবে?

* * *

"বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের" চতুর্থ অধিবেশন ময়মনসিংহে হইয়াছিল। তাহাতে যোগদান করিতে ময়মনসিংহে গিয়াছি। আনন্দমোহন-কলেজ-বোর্ডিংএ আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমার কক্ষে আর কয়েকজন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিও স্থান পাইয়াছেন। "সাহিত্য-সম্মিলন"-অধিবেশনের প্রথম দিন প্রাতঃকালে একজন সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাহারও কোন প্রবন্ধ "সাহিত্য-সম্মিলনে" পাঠার্থ আছে কি?" মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্যালাপ মুখরিত কক্ষটী নীরব হইয়া গেল। বুঝিলাম, সকলেই মায়ের পূজার নৈবেদ্যের অভিলাষী, নৈবেদ্য-রচনার কষ্ট-স্বীকার করে কে? তখন আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া, একটী ক্ষুদ্র কবিতা তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, "এই ঘরে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে ছোট, তবু আমি এই ঘরের সম্মান রক্ষার্থ মায়ের পূজার "অর্ঘ্য" আপনাকে দিতেছি।" তিনি সাদরে কবিতাটী গ্রহণ করিলেন ও কবিতা শেষে আমার নামটী পড়িয়া আমাকে নিবিড় বাহুপাশে বাঁধিলেন। এই নিবিড়-বন্ধন তাঁহার জীবনে আর শিথিল হয় নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদের কক্ষ ত্যাগ করিলে পরিচয়ে জানিলাম, ইনিই আমাদের পরিষৎ-প্রাণ, বোমকেশ। এত সহৃদয় তিনি!

ময়মনসিংহে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রথম দিনের অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবুর মধুর-কণ্ঠে আমার কবিতাটী পঠিত হওয়াতে সভাক্ষেত্রে বেশ একটু আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমি আশাতীত রূপে অভিনন্দিত হইয়া যখন সভামঞ্চ পরিত্যাগ করিতে উঠিতেছি তখন দেখিতে পাইলাম, বহুদূর হইতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বহুকষ্টে জনসঙ্ঘের ভিড় ঠেলিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। আমার সাধ্য নাই যে তাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে পারি। আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আমি গোবিন্দ দাস।" ইনি "কুঙ্কুম", "চন্দন" প্রভৃতির কবি গোবিন্দ দাস। তখনই মনে হইল, আমরা অন্তরের দৈন্য, বাহ্যিক পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদে ঢাকিয়া "মঞ্চাধিপতি" হইয়া সুখে বসিয়া আছি, আর বিপুল অন্তর সম্পদশালী গোবিন্দদাস ছিন্ন মলিন বস্ত্রের বিড়ম্বনায় এতক্ষণ কতদূরে জন-সংঘর্ষে নিপীড়িত হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত কি কথা বলিতেছি, এমন সময় পশ্চাতে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া তাকাইলেই আর একজন বৃদ্ধ মহাত্মা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি বেনোয়ারীলাল।" আমার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইজন শক্তিশালী প্রবীণ কবি—একবারে "দুইদিকে দুই সোনার চূড়া।" আমি গোবিন্দ বাবুর সহিত বেনোয়ারী বাবুর আলাপ করাইয়া দিলাম এবং মহানন্দে সকলে মিলিয়া আমার প্রবাস-বক্ষে ফিরিলাম। বেনোয়ারী বাবু প্রস্তাব করিলেন, কবিবর রাজকৃষ্ণের "বীণার" মত শুধু কবিতায় একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে, গোবিন্দবাবু সাগ্রহে সম্মতি দিয়া বলিলেন, "এ পত্রিকা খানি প্রবীণ ও নবীন কবির সম্মিলন ক্ষেত্র হইবে।" আমি এই দুই হৃদয়বান্ কবিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়া বলিলাম "বর্ত্তমান-যুগে কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা চলিতে পারে না।" কার্য্যতঃও কিছু হইল না।

* * *

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" সপ্তম অধিবেশনে যোগদান করিতে কলিকাতায় গিয়াছি। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হীরেন্দ্রনাথের স্নেহাশ্রমে আমি অতিথি। একদিন প্রাতে আমার নির্দিষ্ট কক্ষে আমি একা বসিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিলাম। এমন সময় একজন শুভ্রবেশ প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! ভাল আছেন তো?" আমি একটু বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি তো আমায় চিনিতে পারেন নাই, তবে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে।" আমিও একটু হাসিয়া বলিলাম, "আমি যদি আপনাকে না চিনিয়াই আপনার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, তবে আমি যে উহা কিছু অন্যায় করিয়াছি, আপনি তাহা বলিতে পারেন না।" তিনি তখন স্মিতমুখে বলিলেন, "আমি অক্ষয় বড়াল। হীরেন্দ্র বাবুর কাছে শুনিলাম আপনি আসিয়াছেন, তাই আপনার সহিত দেখা করিতে আসিলাম"। বহুক্ষণ তাঁহার সহিত আধুনিক কবিতার অস্পষ্টতা ও সমালোচনা-ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে আলাপ হইল। হায়, তখন কে জানিত, তাঁহার সহিত এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ!

* * *

একদিন প্রাতে আমাদের “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের’ ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন তিনি জজিয়তী হইতে অবসর লইয়া, পুনরায় ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, দেখিলাম, তাহা তাঁহার মাড়োয়ারী মক্কেলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে জনৈক ভদ্রলোকের নামে আমার একখানা পরিচয় পত্র লওয়া আবশ্যক ছিল। ভাবিলাম, এত মক্কেলের হাঙ্গামায় এ বেলা তাহা আর হইল না। তিনি সস্নেহে আমাকে নিকটে বসাইলে, আমি তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া বলিলাম, “আপনি এখন এত ব্যস্ত আছেন, জানিতাম না। আমি আবার কবে আসিব, বলুন তো?” তিনি বলিলেন, “আবার আসিবেন কি। আমি এখনই আপনার পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিতেছি।” মনে করিলাম, এত কাজের ভিড়ে তিনি হয়ত দুই পংক্তি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। তিনি সমস্ত কাজ বন্ধ রাখিয়া, চারিপৃষ্ঠা-ব্যাপী আমার এক অতি প্রশংসা-পূর্ণ পরিচয়-পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখুন, জীবেন্দ্রবাবু। হইয়াছে কিনা।” আমি তাঁহার অনন্য-সাধারণ সহৃদয়তা ও সময়াভিজ্ঞতাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া ফিরিলাম। শুনিয়াছি, কোন কোন তথা-কথিত “বড়লোক” আছেন যাহারা প্রার্থীকে, সামান্য সামান্য বিষয়েও, দশ বারো বার ঘুরাইয়া নিজেদের “বড়-মানুষির” জাহির করেন। তাঁহাদের সহিত মহা-প্রাণ সারদাচরণের কত তফাৎ।

* * *

স্যার গুরুদাস বাবুর সহিত কয়েকবার দেখা করিতে গিয়াছিলাম। এই ঋষিতুল্য মহাত্মার পবিত্র-সঙ্গ, আমার নিকটে মহাতীর্থ সম্মিলনের মতই পুণ্যময় বোধ হইত। একবারের কথা বিশেষ-ভাবে আমার স্মরণ আছে। সেবার আমি যখন তাঁহার কাছে যাই, সে সময় তিনি আহ্নিক করিতে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষটাতে অপেক্ষা করিতেছিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, খড়মের খটাখট্ শব্দ শোনা গেল, আমি উৎসুক চিত্তে দ্বারের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, ‘জ্ঞান ও কর্ম্মের’ জীবন্ত বিগ্রহ, গুরুদাস বাবু কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াই আমার কাছে আসিতেছেন, তাহার পূজার কাপড় ছাড়িবার আর অবসর হয় নাই। তাঁহার তখনকার সেই ভক্ত-পূজারির বেশ আমার চক্ষে বড়ই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখাইতেছিল। যেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মণ্যতেজঃদীপ্ত ভূদেব সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। আমি এ জীবনে আমার প্রত্যক্ষ-দেবতা পিতামাতার পদধূলি ভিন্ন আর কাহারও পদধূলি গ্রহণ করি নাই। কিন্তু সেদিন সসম্ভ্রমে তাঁহার পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৃষিত-আত্মা যেন চরিতার্থ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “জীবেন্দ্র-বাবু! আপনি অনেকক্ষণ একা বসিয়া আছেন, কিছু কষ্ট হয় নাই তো?” এই বলিয়াই তিনি বৈদ্যুতিক পাখাটা খুলিয়া দিলেন। তারপর সেদিন তাঁহার সহিত কি কথা হইল, আজ আমার ঠিক মনে নাই। আমার সমস্ত মন যেন তাঁহার সেই দিব্য বেশে ও আশীর্ব্বাদে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; তখন আর কোন কিছুই ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

যে দিন কলিকাতায় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে, সে দিন প্রাতে আমি গাড়ী চড়িয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, "সম্মিলনের" প্রধান-কর্ম্মী ব্যোমকেশ বাবু গামছা হাতে বাজার করিয়া আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। তিনি আমার পাশে বসিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ সকালে আমার একটা মেয়ে মরিয়াছে; তাহাকে ঘাটে পাঠাইয়া, আমি বাজার করিতে আসিয়াছি। এখনই আবার আমাকে স্নানাহার করিয়া, "সাহিত্য সম্মিলনে" যাইতে হইবে।" তিনি এ কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন, যেন আজ কন্যা-বিয়োগ তাঁহার নহে, আর কাহারও হইয়াছে, এবং, এ গোলযোগে, স্নানাহার করিয়া "সাহিত্য সম্মিলনে" উপস্থিত হইতে হয়ত তাঁহার একটু দেরী হ'বে, এ জন্য তিনি ক্ষুন্ন। আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই কর্ত্তব্য নিষ্ঠ সাহিত্য-প্রাণ পুরুষসিংহের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। একটা সান্ত্বনার বাণীও আমার মুখ দিয়া সরিল না।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রভেদ।

[যুক্তিবাদীর কথা।]

ছুঁয়োনা উহারে, ও যে গো চণ্ডাল
বসিতে দিয়োনা কাছে
যুক্তি ও তর্ক তুলি, যুক্তিবাদী
কহে, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।
ছি, ছি, ও মূর্খ, সভামাঝখানে
উহাকে না দিয়ো স্থান,
"জ্ঞানে" ও "ধর্ম্মে" উচ্চ আমরা
যাবে যে মোদের মান।
ক'রনা, ক'রনা, ওই দীন হীনে
এখানেতে নিমন্ত্রণ,
হ'ক না আত্মীয়, ক'রনা স্বীকার,—
বোল না যে ও আপন।
চাচা আপনার বাঁচারে পরাণ,
মরুক না ওটা কেন,
আপনি বাঁচিলে বাপের যে নাম,
ও বাঁচিলে হবে হেন।
কটা উপদেশ দিলাম আজিকে,
আরও বলিব পরে,
সভ্য-জগতে, "যুক্তির" মান
আদর সকলে করে।
"লাভ" আর "ক্ষতি" সব দিক থেকে
খতায়ে দেখিবে আগে
করিবে তেমন, যেমন দেখিবে
লাভ বেশী যেই ভাগে।

[প্রেমবাদীর কথা।]

জাতি কুল মান না মানিবে কিছু
সকলেরে দিবে কোল
এ যে শ্রীক্ষেত্র প্রেম পুরীধাম
করিও না কোন গোল।
অন্ধ, দরিদ্র, সহায় বিহীন—
এদেরি টানিবে কাছে
কেননা এদেরি জ্ঞানের অভাবে
"জাতি" পরাধীন আছে।
হয় যদি "পর" দিবে পরিচয়—
অন্যে, "আপন" বলি,
তা'হলে তাদের কেহ পারিবে না
যাইতে চরণে দলি।
কেহ কিছু নাই, আহা, বাছা বলি
ওদেরি ত ডাকি লবে,
না আসিলে হাত ধরিয়া তুলিয়া
ময়লা মাটি মুছাইবে।
প্রেমবাদী কহে, শুন মোর কথা
যদি স্বর্গ শান্তি চাও,
আপনারে, ভাই, জগতের পায়
যাচিয়া বিলায়ে দাও।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

স্বাধীনতা।

আমার স্বাধীনতার সীমা, অন্যের স্বাধীনতা। আমি তাহা করিতে পারি, যাহাতে অন্যের অপকার না হয়। এ কথাটি অনেকেই স্বীকার করিবেন। স্বাধীনতা এবং যথেচ্ছাচারের সীমা এইখানে।

যথেচ্ছচার নিন্দনীয়, কিন্তু স্বাধীনতার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র। অথচ যদি আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তোমার পদলেহন করি, যদি তোমার উদগার ভক্ষণ করি, যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দেহ বিক্ষত করি, যদি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আত্মহত্যা করি, আমাকে অপরাধী বলিয়া তোমরা দণ্ডিত করিবে, দণ্ড, রাজ-দরবারেই হউক, আর, সমাজেই হউক। আমার বস্ত্র আমি টানিয়া ছিঁড়িব, আমার রোপিত লতা আমি উন্মূল করিব, আমার পোষিত পাখী আমি আকাশে ছাড়িয়া দিব, আমি উর্দ্ধপদ হইয়া দুই হস্তে চলিব, সম্মুখ-কেশ-গুচ্ছ বেণী বিনাইয়া পশ্চাৎ কেশ মুণ্ডন করিব, আমি পায়ে ইয়ারিং কানে চন্দ্রহার পরিব, বাঙ্গালার সাটী পরিয়া গায়ে ওভারকোট দিয়া মস্তকে চীনা টুপি পরিয়া, দিবসে বাতি জালিয়া, বৃক্ষ মূলে বা গৃহে প্রাঙ্গনে বসিয়া থাকিব, তুমি আমাকে টিট্‌কারী দিবে কেন? কার্য্য ছাড়িয়া দাও, বলিতে পার যে আমার দেখিয়া দশজনে শিখিতে পারে। পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করিতে পারি বলিয়া, দণ্ড দিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু আমি গোপনে মনে মনে যে চিন্তা পুষিয়া রাখি, কেহ পীড়াপীড়ি না করিলে কাহাকেও যাহা বলি না, তাহার জন্য অপদস্থ, অবমানিত, উপেক্ষিত বা উপহাসিত হইতে হয় কেন? বুঝিলাম, আমার স্বাধীনতা জ্যামিতিক বিন্দু-মাত্র,—অবস্থিতি আছে, কোন বিস্তৃতি নাই।

পক্ষান্তরে, প্রতিভা সমাজের কঠোরহস্তে রুদ্ধশ্বাস, বিগত-জীবন হইলে, সমাজের অস্তিত্ব থাকিত কোথায়? স্বতন্ত্র পাশ-প্রকৃতি বনচারী, আজ সকলে বনে বনেই ফিরিতাম, ঘুরিতাম। তোমাদের উপহাস, পরিবাদ, উপেক্ষা করাতেই আমার কার্য্য-কারিতা। কারা-কুটীরের প্রাচীর-মধ্যে গ্যালিলিওর উদ্ভাবনা পর্য্যবসিত হইত, যদি সমাজ-দণ্ডে বীরপুরুষ ত্রস্ত হইতেন। বিষ-লতার বিষ-সঞ্চারে ক্রুশে সলাকা প্রহারে কত অমৃত বল্লরী অঙ্কুরে, কত জীবন্ত জীবন কোষ অকালে শুষ্ক হইয়াছে, অন্যথা ঘটিলে বুঝিতে পারিতাম। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠাস্থির বিবর্ত্তন-সঞ্জাত বলিয়া জার্ম্মানাচার্য্য যে দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, ঘাতকের কুলিশাঘাতে সে দিন গেটের প্রাণান্ত ঘটিলে, কি রত্ন অন্ধকারের অন্ধতম গুম্ফে গুপ্ত থাকিত, একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি! ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া, শাক্যসিংহ সমাজ-বক্ষঃস্থলে পদাঘাত না করিলে, কোথায় থাকিত হিন্দুসমাজের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন? সিদ্ধার্থের সিদ্ধার্থতা নিরর্থক হইত। যে সকল মনীষী উপস্থিত অবস্থান বিশৃঙ্খল করিয়া, শত সহস্র জনের আনন্দ-কানন শ্মশানে পরিবর্ত্তন করিয়া, লক্ষ লক্ষ জনের ঐহিক পারত্রিক অপকার-সাধন করিয়া, আপনাকে চির-পূজনীয় করিয়া গিয়াছেন, কে তাঁহাদের গৌরব গানে না যোগ দেয়? তবে মানব-স্বাধীনতার বিস্তৃতির অন্ত কোথায়? যাহাকে বিন্দু বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তাহা কি মহোদধির ন্যায় বিশাল নহে?

আমি সমাজ-শৃঙ্খলের একটা বন্ধনী। আমাকে স্থান দিবার জন্য অন্য সকলকে, কষ্ট-স্বীকার করিয়া, সরিয়া বসিতে হইয়াছে। আমার যাহারা তাহাদিগকেও স্থান দিতে হইবে। আমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহি। হাত কাটিলাম, কিন্তু দেহে আঘাত করিলাম না, আত্মবিকৃত করিলাম, কিন্তু সমাজকে অপকৃত করিলাম না, উভয়ই অসার প্রলাপ। আমার কার্য্যে সমাজ রঞ্জিত, কলঙ্কিত, সমাজ আমাকে যেমন প্রভাবিত করে, আমার দ্বারা তেমনি প্রভাবিত হয়, কেবল মাত্রার উত্তর বিশেষ। আমাকে ছাড়িয়া সমাজ নহে, সমাজ ছাড়া আমি নহি। আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে, এবং যাহারা আমার তাহাদিগের দ্বারা, পরোক্ষভাবে, সমাজকে অনুপ্রাণিত করি। আমি বিষবিন্দু ঢালিয়া সমস্ত গরলিত, অমৃত ঢালিয়া সমস্ত সঞ্জীবিত করিতে পারি। জগতের অপরিজ্ঞাত গূঢ় চিন্তা আমাকে ও আমাদিগকে, সুতরাং সমাজকে, প্রভাবিত করে, সুতরাং, অন্যের অপকার আমার স্বাধীনতার সীমা নহে। যাহাতে আমার অপকার, তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা, যাহাতে আমার উপকার, তাহাতে সমাজের উপকার, যাহাতে সমাজের উপকার তাহাতে আমারই উপকার।

আমার জীবন অন্যের জন্য, কথাটা মহা সত্য, আমার জীবন আমার জন্য, এটি মহত্তর সত্য। যখন স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী জীব উদ্ধবক্ষ তালবৃক্ষের ন্যায় কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, কাহাকেও আশ্রয়চ্ছায়া বিতরণ না করিয়া, স্বয়ং-সিদ্ধ স্বার্থপর হইয়া জীব-সাম্রাজ্যে বিরাজ করিত, তখন কোনও মহানুভব ব্যক্তি "Live for others" এই সত্যের আবিষ্কার করিয়, অনাবৃত-বক্ষ নীরস পাষাণ কোমল শৈবালে আবৃত করিয়াছিলেন। যখন লতায় পাতায় আকুল হইয়া, সামাজিকতার আওতায় জীবের স্বাধীনতা ব্যক্তিগত জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহত্তর নীতিবেত্তা বলিয়াছিলেন"Live for yourself"। পরের উপকারের জন্য যদি সকলে প্রাণ-ধারণ করে, তাহা হইলে সকলেরই আপন আপন কার্য্য চলিয়া যায়। বস্তুতঃ, একটু ঘোরাল রকমে, একটু আড়ে আড়ে, সহজ কথাটা বাঁকাইয়া সুন্দর করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা "Live for others" এ সত্যের মূল, স্বার্থপরতা। প্রাচীন কালের তেজস্বী লোকেরা বাঁকা চুরা বুঝিতেন না, চক্ষু-লজ্জার খাতির রাখিতেন না, যাহা মনে আসিত, তাহা মুখ দিয়া ফুটিত। তাঁহারা পরদার আড়াল বুঝিতেন না। আম-খাস দেওয়ান-খাস রাখিতেন না। সভ্যতা, সত্যকে রঞ্জিত করিতে চাহে অলঙ্কৃত করিতে চাহে, কুইনাইনের বড়ির উপর চিনির পুট না দিলে, কেহ গ্রহণ করিতে চায় না।

আমি আপনার দ্বারা পরের কথা অনুমান করি। আমার মন আছে, তাই পরের মন কল্পনা করি। আমার যাহাতে সুখ দুঃখ লাভালাভ, পরের তাহাতেই সুখ দুঃখ লাভালাভ, অনুমান করি। বস্তুতঃ, আপনাকে মান-দণ্ড না করিলে, পরের ওজন কিছুতেই বুঝিতে পারি না। এমন অবস্থায়, যে আপনার জন্য বাঁচিতে না চাহে, সে পরের জন্য বাঁচিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থ, আপনার লাভালাভ বুঝে না, সে পরের কিসে উপকার হইবে বুঝিতে পারিবে, অসম্ভব কথা। আমার পরিমাণে আমি আমার দেবতা সৃষ্টি করি, আমার পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য সৃষ্টি করি, আমার পরিমাণে আমার ঘর-সংসার বাঁধিয়া লই। সকল কার্য্যে, আমি প্রধান। আমি একমাত্র।

আমি আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারি না। আমাকে অতিক্রম করিয়া আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমি তোমার জন্য, বিশ্ব সংসারের জন্য খাটিব বিশ্বের হিতার্থে আপনাকে অগ্রাহ্য করিব, বলিদান দিব, যাঁহারা আত্ম-পীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আত্মোৎসর্গ শিখেন নাই, এ সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের কল্পনা। আমাকে লইয়া সংসার, পৃথিবী জগৎ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য। আমার মান-দণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিমিত। আমি এই অনন্ত সংখ্যার বন্ধনী। আমাকে উপেক্ষা করিলে সকলই আদিম অবন্ধনে পর্য্যবসিত হইবে। সৃষ্টি-পূর্ব্ব অব্যক্ততা আসিবে। সহজ কথা বাকাইতে গিয়া, অদূরদর্শী নাস্তিবাদীগণ মনুষ্যদিগকে নাস্তিশৃঙ্খ নাস্তিকতায় অবনত করিয়াছেন। ধনুকের ছিলা কাটিয়া দাও, পৃথিবী সুস্থতা লাভ করিবে।

অন্যকে ছাড়িলে, আমার কোন কার্য্যই থাকে না, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়। দশজনকে লইয়াই আমি, সমাজকে লইয়াই আমি, স্বদেশকে লইয়াই আমি। আমার বন্ধনী যত প্রসারিত করিবে, আমার শূন্যতা পূর্ণতায় তত পরিণত হইবে,—আমার মহত্ত্ব বাড়িবে। আমার আমিত্ব আমার দেহের অতীত, আমার পরিবারের অতীত, আমার গোত্রের অতীত, আমার সমাজের অতীত, আমার দেশের অতীত, আমার পৃথিবীর অতীত, আমার হৃত-কালেরও অতীত। এই 'আমার' যে স্বার্থ, সে স্বার্থ জগতের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। সকলের স্বার্থ লইয়া আমার স্বার্থ। জিনিষটা আমার, দেখি অন্যের ভিতর দিয়া। ইহাতে, সত্যের সরলতার সহিত, কল্পনার সৌন্দর্য্য সংমিশ্রিত হইয়া, অতি শোভনীয় হইয়া উঠে।

স্বার্থ ও পরার্থতার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা একবার ভারতবর্ষে হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। সে সমন্বয়ের আচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টা সফল হয় নাই।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন রাজ্যং ন সুখানি চ ॥ ৩১।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন ॥ ৩৪।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫।
*　　　*　　　*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। ৩৬।

—প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ, রাজ্য ধন, যশ গৌরব, পুণ্য স্বর্গ অমরত্ব, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কত সুখের প্রলোভন

দেখাইয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সরল ধর্ম্মভাবের সম্মুখে কূট-নীতিক শ্রীকৃষ্ণের তর্কজাল বিস্তার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বরং আচার্য্যের প্রতি একটু ঘৃণার ভাব উদয় হয়। অর্জ্জুন বালক নহেন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উচ্চ "একব্বরী" ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞও নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, জ্ঞাতি গোত্র শত্রুদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিলে, অর্জ্জুন ধরিত্রীর অসাধারণ রাজত্ব ভোগ করিবেন। অর্জ্জুন বুঝিলেন, সুখ ভোগ ত সকলকে লইয়া হয়, সকলকে বধ করিয়া, বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া, কেহ একজন সুখী হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, যুদ্ধ কার্য্য ক্ষত্র ধর্ম্ম। অর্জ্জুন বুঝিলেন সার্ব্বভৌম-ধর্ম্মের বিপরীত স্থান বা কালীয় ধর্ম্ম উপেক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, যশ লোভনীয়, নিন্দা উপেক্ষণীয়। অর্জ্জুন বুঝিলেন, সার্ব্বভৌম সুকৃতির জন্য কয়েক জনের যশ বা নিন্দা গণনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থপরতার গুণগান করিলেন, অর্জ্জুন, পরার্থপরতার মাহাত্ম্য বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, পরার্থপরতার স্তুতিবাদ করিলেন, অর্জ্জুন, স্বার্থপরতার গুণবাদ বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মৃত্যু অপরিহার্য্য দেখাইলেন, অর্জ্জুন অমরত্বের আকাঙ্ক্ষণীয়তা উপলব্ধি করিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া, দ্বাপরের মাকিয়াভেলী নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রস্তাব করিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের সংক্ষেপ অর্থ,—নদীস্রোতে গা ঢালিয়া দাও, কোথায় যাইবে কল্পনা করিও না, স্রোতে যেখানে লইয়া যায় সেইখানে চল। কার্য্য-ফল যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। তুমি আমি নিমিত্ত-মাত্র। পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তোমার আমার তুলনা করিবার সাধ্য নাই। "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব।" পরার্থপরতা প্রচার করিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনাশ হয়, কর্ম্মের উৎস শুকাইয়া যায়, শূন্যের সমষ্টিতে সংখ্যা গড়িতে হয়। স্বার্থপরতা প্রচার করিলে, দুর্ব্বল মনুষ্য জগতকে উপেক্ষা করিয়া, অহঙ্কারী হইতে পারে। এ জন্য কাহারও আশয় না লইয়া, ফলাফল গণনা না করিয়া,—কাহার ভাল হইবে, কাহার মন্দ হইবে, না দেখিয়া,—যাহাতে নিরুক্ত হইবে, তাহাই কর। কর সকলি, যাহা তোমার আত্মীয়তা তোমাকে করিতে বাধ্য করে। তোমার মাত্রায় তুমি কার্য্য কর।

সংক্ষেপে, শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন। তবে, স্বার্থপরতার শ্রুতিকটুদোষ পরিহারার্থ, তাহাতে নিষ্কামতার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। সে অলঙ্কারের গরলে, তৎ প্রচারিত সত্য জর্জ্জরিত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, উন্মাদ ও বাতুলের অবশ্য-কর্ত্তব্য, মনুষ্যের অকর্ত্তব্য, অসম্ভবনীয়। নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রচারে আর্য্যবংশের কর্ম্মস্রোত বন্ধ হইয়া, জড় আলস্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সন্ন্যাসী, ফকির ও দরবেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহারা অলঙ্কারের শোভা, বিশেষণের গরিমা, স্বত্ব স্বরূপে গণনা করিয়া আত্ম প্রতারিত হইতে চক্ষু বুজাইতে চাহেন, তাঁহাদের পথ উন্মুক্ত, আমরা বাধা দিব না।

স্বার্থপরতা কর্ম্মের উৎস, ভাবের জননী। স্বার্থপরতা জীবের প্রাণ, মানবের প্রাণতা। মনুষ্য কর্ম্ম-বলের নিমিত্ত, স্বার্থপরতা কার্য্যের নৈমিত্তিক কারণ। আমার যাহাতে অপকার, তাহা আমার স্বার্থপরতার—আমার কর্ম্মের—সীমা। কিন্তু এ সীমা অস্পষ্ট। স্পষ্টীকৃত করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে আমার উপকার, তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা, আমার কর্ত্তব্যের মান-দণ্ড। যাহাতে আমার উপকার, তাহাতে জগতের উপকার। অধিকাংশ লোকের

অধিকতম সুখ কিসে হয়, জানিবার একমাত্র উপায়, আমার স্বার্থ। আমার স্বার্থের মান-দণ্ডে জগতের সুখ পরিমিত। স্বার্থের মান অনিত্য, স্বীকার করি। আজ যাহাতে আমার উপকার, কাল তাহাতে উপকার হইবে না জানি, কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোকদেরও সুখ দুঃখ এইরূপ পরিবর্ত্তনীয়। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা অসত্য হইবে, বাঙ্গালায় যাহা ধর্ম্ম পাঞ্জাবে তাহা অধর্ম্ম। নদীর একপারে যাহা কর্ত্তব্য, অপর পারে তাহা অকর্ত্তব্য। একস্থানে যাহা পাপ, স্থানান্তরে তাহা পুণ্য। পাপ পুণ্যের ভৌগলিক সীমা আছে, পর্ব্বত কন্দরে কর্ত্তব্যের সীমা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে। এই চির-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অন্য কোন দণ্ডে কর্ত্তব্যের পরিমাণ যথাযথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আমার স্বার্থ-ই একমাত্র সার্ব্বভৌম মান-দণ্ড। আমার স্বার্থের নিরাপক, আমার কর্ম্ম দণ্ড। আমার স্বার্থ, আমার উপকার, আমার কর্ত্তব্যের সীমা, ইহা স্ববুদ্ধি ও স্বভাব-সিদ্ধ।

৺শ্রীবিনোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রকাশক—শ্রীপ্রণব রায়চৌধুরী।

আমি ও আমার।

ব্যবহারিক।

"আমি" "আমি" কর মন, "আমারেতে" ভয়।
"আমি" তোর চির সাথি, "আমার" তা' নয়।
পিতা, মাতা, দারা, সুত,
ধন, জন, দউলত,
আমার যা' কিছু, তারা মরণে রয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

আমি ভাবি, আমি করি, ধরা আমি-ময়।
আমি হাসি, আমি কাঁদি,—জগতে কি হয়?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,
"আমি" তার পদ স্বামী
"আমার" অসীম বাণী ধরা ছেয়ে রয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

অভিমান-হত আমি, মন ক্ষুদ্র রয়।
"আমার" ছাড়িলে আশা ক্ষুদ্রতর রয়।
আশা-ভঙ্গে, শান্তি নাশ,
ক্ষুদ্র আশে, তৃপ্তি-আশ,
কোন পথে যাবে মন কর সুনিশ্চয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

লোকে কবে কিবা বলে সদা প্রাণে ভয়
লোক লয়ে কিবা কাজ, আমি "আমি"-ময়।
আমি শুধু জানি "আমি,"
মোরে জানে অন্তর্যামী,
সে শুধু আমার বলি, আর কিছু নয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

পারমার্থিক।

ইন্দ্রিয়-তন্মাত্র যাই জড় বীজ-ময়,
"আমার" "আমার" করি মন জড়ে রয়।
জড়ের মমতা যাই
সদা মন মাঝে পাই,
সুধী-জনে মন তোরে জড় বলি কয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

"আমি"র আমিত্ব শুধু জড় নিয়ে নয়।
মমতায় মন যবে বিচলিত হয়,
কার আজ্ঞা বহে তা বা,
বিতাড়িত কার দ্বারা?
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে অহংতত্ত্ব হয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

বিশ্বময় আমি তত্ত্ব শাস্ত্রবাণী কয়।
বাল-বক্ষা ধ্যানে যবে, জড় কোথা রয়?
"আমার"-বাণীর সৃষ্টি
ভেদে, কয় সা ম্বা-দৃষ্টি,
শাক্যসিংহ মুগ্ধ তাই, বিশ্ব "আমি"-ময়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

"আমার" মায়ার বাণী বিশ্ব ব্যেপে রয়
বারিধি নীলিমা-নিধি যথা মনে হয়।
মৌলি এক দ্বৈতময়,
মায়াশক্তি পরিচয়।
"আমার" নীলিমা-আভা, মূলে কিছু নয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

শ্রীবিপিনবিহারী নিয়োগী।

স্বরাজ।

[৭৯ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

(১০)

রাষ্ট্রের মূলভিত্তি যদি শক্তি, রাষ্ট্রশক্তিরও মূলকথা লোক-বল। আধুনিক সভ্য-জগতে, আর এক বড় কথা—অর্থ-বল।

জড়-শক্তি ও পশু-শক্তিকে রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত করে কে? মানুষ। সংহারক-যন্ত্র আবিষ্কার করে, মানুষ; আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করে, মানুষ। বহুজনের সমবেত উদ্যোগে, মানুষকে বিনাশ করিবার ব্যবস্থা করে, মানুষ। সংহার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গণিত, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োগ করে—মানুষ। জড় ও পশুকে বশ করিয়া, সংহার-শক্তি আহরণ করে—মানুষ। আর এ সব একজন রাষ্ট্রপতির সাধ্যায়ত্ত নয়। সহস্র মানুষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্র শক্তির মূলকথা **লোক-বল**।

কোনও রাষ্ট্রের লোকবল কত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, শুধু তাহার লোকসংখ্যা জানিলে চলে না। লোকসংখ্যা একেবারে কম হইলে, সে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী হইলেই সে রাষ্ট্র তদনুযায়ী শক্তিশালী হইবে, তাহাও নয়। মনে কর, একরাষ্ট্রের জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটী, তাহার মধ্যে ত্রিশকোটী নিরক্ষর, ও বাকী তিন কোটীর মধ্যে, মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ লোকের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি একটু জাগিয়াছে ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুটা পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। আর ঐ তেত্রিশ কোটীর মধ্যে মাত্র পাঁচলক্ষ লোক রাষ্ট্র সেবায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাকী বত্রিশ কোটী পঁচানব্বই লক্ষ লোক, স্বীয় স্বীয় পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইলেও, তাহাদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতি ও স্বরাষ্ট্র-বোধ সম্যক্ পরিস্ফুট না হওয়াতে, রাষ্ট্র-সেবায় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে তাহারা শেখে নাই, ও সুনিয়ন্ত্রিত সমবেত উদ্যোগে অনভ্যস্ত বলিয়া, তাহারা রাষ্ট্র-সেবা-কুশল নহে। আর মনে কর, অপর এক রাষ্ট্রের পূর্ণ লোক-সংখ্যা মাত্র তিন কোটী, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিত, স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ, স্বরাষ্ট্র-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সেবায় স্বীয় স্বীয় সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে তাহারা যেমন যুদ্ধের আয়োজনে, তেমনই শান্তির সময়ে, দশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একযোগে কার্য্যোদ্ধার করিতে অভ্যস্ত। তবুও কি বলিবে যে, তেত্রিশ কোটীর রাষ্ট্র, তিন কোটীর রাষ্ট্র অপেক্ষা এগার গুণ শক্তিশালী?

রাষ্ট্রের লোকবল চাও, তবে সুগঠিত সবল সুস্থ শিশুর প্রয়োজন, সর্ব্বাগ্রে। তাহার জন্য সুস্থ সবল সদাচারী পিতা, পূর্ণাঙ্গী দৃঢ়ব্রতা সন্তান-পালন-কুশলা স্বদেশ-পরায়ণা জননী; প্রচুর স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য ও পানীয়, ব্যাধি-বিমুক্ত, স্বাস্থ্য-বিধায়ক জনপদ—এ সকলেরই প্রয়োজন। আর তেমনই প্রয়োজন, সহিষ্ণুতা-সংযম-সাধনানুকূল, শ্রমাভ্যাস-প্রবর্ত্তক, স্বাবলম্বনেচ্ছা-পরিপোষক সামাজিক রীতি-নীতির। জনসংখ্যা যতই হউক, রাষ্ট্রের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, জলবায়ু শ্রমশীলতার অনুকূল না হইলে, সে রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকিতে পারে না। পণ্ডিতেরা বলেন, রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ—প্লেগ-মহামারী ও ম্যালেরিয়া।

রাষ্ট্রের লোকবল প্রজাসাধারণের দৈহিক শক্তির উপর যেমন নির্ভর করে, তাহাদের মানসিক-

শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের উপরও তেমনই নির্ভর করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালন দ্বারা দৈহিক বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হয়। মানসিক বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য, মনোবৃত্তি গুলির পরিচালনা তেমনই প্রয়োজনীয়। সভ্যতার ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন বর্ণমালার আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু, কবি ও কাব্যের সাহায্যে, সামাজিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠিত হইত। তখন লেখাপড়া ছিলনা, কিন্তু শিক্ষাদান ছিল। তখন গুরু লিখিতেন না, শিষ্য পড়িত না। গুরু বলিয়া গেলে, শিষ্য শুনিয়া অনুবচনের দ্বারা শ্রুতি বা স্মৃতি আপন মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিত। তখন শিক্ষা বিস্তারের প্রণালী ছিল, অনুবচন। লোক-শিক্ষার উপায় ছিল, কবিদিগের গীত শ্রবণ। এ কালে বা সে কালে, তোমার আমার জীবনে আগে গদ্য, পরে পদ্য। সাহিত্যের ইতিহাসে আগে পদ্য, পরে গদ্য। যে কারণেই হউক, কবির আধিপত্য উঠিয়া গিয়া এখন গদ্যের যুগ চলিয়াছে। অনুবচনের যুগ চলিয়া গিয়া এখন লেখা পড়ার যুগ চলিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বহু বহুতর সংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। জগমান্য সম্রাট্ অশোক লোক-শিক্ষার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে লোক শিক্ষা ক্রমশঃ সুবিস্তৃত হইতেছে। পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিবার প্রথম সোপান এখন বর্ণমালার সহিত পরিচয়। সুতরাং, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন লোক-শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উপায় বর্ণপরিচয়, লেখা-পড়া। জ্ঞান লাভে যদি শক্তি লাভ সম্ভব হয়, তবে রাষ্ট্রের লোকবল বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান লাভের উপায় লেখাপড়া, বর্ণপরিচয় সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। তারপর জন সাধারণের পর্য্যবেক্ষণ গণনা, গঠন প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ করিতে হইবে। বাষ্পীয় যানের আবিষ্কারের ফলে জগৎব্যাপী প্রতিযোগিতা যখন অনিবার্য্য, তুমি চাও আর নাই চাও, চীন দেশ হইতে মুচি, মিস্ত্রী আসিয়া যখন ভারতবাসী চর্ম্মকার ও সূত্রধরের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইতেছে, তখন রাষ্ট্রের লোকবল বৃদ্ধির জন্য প্রজা সাধারণের মনোবৃত্তি-বিকাশের উপায় তাহাদের সন্মুখে উপস্থিত করিতেই হইবে। এক কথায়, রাষ্ট্রের সকলের জন্য কর্ম্মোপযোগী নিম্ন-শিক্ষার আয়োজন চাই। নতুবা, রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা তেত্রিশ কোটী হইলেও, রাষ্ট্রের লোকবল তদনুরূপ হইতে পারে না।

দৈহিক শক্তি লাভ হইলে, মনোবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইলে, আরও কিছু চাই। প্রজা-সাধারণের চরিত্র সুগঠিত হওয়া চাই। অনেকের এখনও ধারণা আছে যে, যে মানুষ বারবনিতা বা পরদারে আসক্ত নহে, সেই সচ্চরিত্র। সচ্চরিত্রের ইহা অতি হীন আদর্শ। এই আদর্শানুযায়ী জীবন যাপনের জন্য, কামেন্দ্রিয় সংযমেরও তেমন প্রয়োজন হয় না। মনে কর, এক জন অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছে ও তাহার স্বীয় পত্নীর প্রতি অসংযতেন্দ্রিয়। এই হীনাদর্শানুসারে সেও সচ্চরিত্র। কামেন্দ্রিয়-সংযম সচ্চরিত্রের একটী একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নহে। রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ যথা-সম্ভব সচ্চরিত্র না হইলে, সে রাষ্ট্র তেমন বলশালী হয় না। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইলেই, চাই সত্য-পরায়ণতা, চাই দায়িত্ব-বোধ, চাই স্বদেশ-প্রীতি, চাই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, চাই দৈহিক জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সততা ও সুশৃঙ্খলা, সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন সিদ্ধিতে আনন্দ-বোধ ও নিপুণতা, দশের সহিত সমবেত উদ্যোগে আত্ম-সম্বরণ ও উৎসাহ, রাষ্ট্রোন্নতি-কল্পে সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন, চাই

প্রীতিতে বিশালতা, চরিত্রে দৃঢ়তা অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। তবে ত লোক-সংখ্যায়, লোক বল।

এমন সময় ছিল, যখন লোকে সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত যে দলপতি বা রাষ্ট্র পতি দেবতার অংশ। লোক তখন দেব আজ্ঞা মনে করিয়া, রাষ্ট্রপতির আদেশ শিরধার্য্য জ্ঞানে, বিনা বিচারে পালন করিত। খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রপতিকে দেবতার প্রতিনিধি বলিয়া ইংলণ্ডের জ্ঞানীগণও মানিতেন। বিস্মার্কের ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত এক সময় জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিকে দেব প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়াছেন। জাপানের মিকাডোর সোভাগ্য-রবি আজও অস্তমিত হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে দেবতার অংশ বলিয়া বিশ্বাস এখন আর লোকে রাখিতে পারিতেছে না। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে যে টুকু বা রাজভক্তি ছিল, যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ কে কোথায় খসা-তারার মত অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। আর যে দুই চারিজন এখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে, বেচারীরা দেব প্রতিনিধিত্বের কথা, কোনও প্রকারে আপনাদিগকে জন-প্রতিনিধি সাব্যস্ত করিয়া, সিংহাসন বজায় রাখিতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য-বান মনে করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রাজভক্তির মূল এখন আর প্রজার হৃদয়ে, তাহার সহজ ধর্ম্মভাবে নিহিত নহে। সে কালে রাজার কর্ত্তব্য ছিল, সুশাসন, বিনিময়ে প্রজার কর্ত্তব্য ছিল রাজভক্তি। রাজা প্রজা পালন করিতেন, প্রজা রাজাকে হৃদয়ে ভক্তি করিতেন। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ এখন নিজেরা সু বা কু কোনই শাসনই করেন না। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ শাসনভার নিজেদের হাতে রাখিতে চাহিলেও, প্রজা তাহা চাহে না ও রাখিতে দেয় না। প্রজা সুশাসন যত চাহে, তার বেশী চাহে স্বয়ং শাসন। এখন প্রকৃত পক্ষে শাসন কার্য্য প্রজাই করিতেছেন রাজা করেন না। সুতরাং রাজভক্তি ম্লান হইয়া আসা স্বাভাবিক। এ রাজভক্তির যুগ নয়, এ রাষ্ট্রপ্রীতির যুগ।

এ যুগে পরের ইচ্ছায় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইবে। আর রাষ্ট্রের লোকবল প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী করিতে হইলে রাষ্ট্রের জনসাধারণের চরিত্র গঠন অত্যাবশ্যকীয়। এই চরিত্র-গঠন সাধনা যদি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবেই তাহা সহজ ও সতেজ হইবে। কিন্তু সে ধর্ম্মের আদর্শ কি হইবে? সে আদর্শ রাষ্ট্র শক্তি বৃদ্ধির অনুকূলও হইতে পারে, প্রতিকূলও হইতে পারে। তুমি কোন আদর্শ চাও, তাহা তোমাকে বাছিয়া স্থির করিতে হইবে। মানব-প্রকৃতির সহস্র সদ্বৃত্তির মধ্যে কোন্‌গুলির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জাতীয়-জীবনকে সুগঠিত ও সবল করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বাছিয়া স্থির করিতে হইবে। একথা নিশ্চিত যে সকল সদ্বৃত্তির অতিমাত্রায় সাধনা, রাষ্ট্র শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল নহে। রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির অনুকূল আদর্শের আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন বলিতে চাই যে, আদর্শ মহান্ উদার বা শান্তি-প্রদ হইলেই যে তাহা রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির উপযোগী হইবে, এরূপ মনে করা ভুল। যে আদর্শে মানবের শরীর একেবারে তুচ্ছ আর তাহার সমগ্র চিন্তা ও চেষ্টা শুধু তাহার আত্মাকে লইয়াই ব্যস্ত; যে আদর্শে ইহকালের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ও মৃত্যুর পরপারের জীবন লইয়াই মানুষ অত্যধিক ব্যস্ত, যে আদর্শে ইহজন্ম প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল মনে করিয়া, মানুষ

জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা এ জগতে তাহার পুনর্জন্ম নিবারণের চেষ্টা করে, যে আদর্শানুযায়ী সাধনার ফলে, জনসাধারণ পুরুষকার ভুলিয়া গিয়া, সকল আনন্দ ও সুখের প্রত্যাশা করে, মৃত্যুর পরপারে, যে আদর্শে মানুষ অত্যাচারীকে না পারে ক্ষমা করিতে, আর না পারে শাসন করিতে, ও পরকালে, ভগবানের হাতে, দুষ্টের দমন হইবেই হইবে, এই আশায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, যে আদর্শে অদৃষ্ট-বাদে সাধারণ মানুষকে সকল দুর্নিবার অশুভের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে পরামর্শ দেয়, যে আদর্শে, হয় পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচারী, নয় কপটাচারী সাধু বেশী লম্পট, এ দুইয়ের মাঝা-মাঝি কোনও ব্যবস্থা নাই, যে আদর্শে সংযত, ধর্ম্মপরায়ণ লোকের পক্ষে ব্যবস্থা বনবাস, যে আদর্শে মানুষ জীবের প্রতি অহিংসা ও মৈত্রীর মাত্রা সামলাইতে না পারিয়া, মানবের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করে—সে সকল আদর্শ মহান্‌ উদার ও শান্তিপ্রদ হইতে পারে। সে সকল আদর্শের গৌরবের হানি করিতে আমি চাহি না। কিন্তু, তাহার ছায়ায় গঠিত জাতীয় চরিত্র রাষ্ট্রের লোক-শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল নয়, ইহা সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। এ আদর্শগুলি কোনও কাজের নয়, এমন কথা বলিতেছি না। এ আদর্শে গর্ব্বানুভব-যোগ্য ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব নাই, তাহাও বলিতেছি না। কিন্তু এ আদর্শে গঠিত প্রজা-শক্তি, রাষ্ট্র-শক্তিতে হীন হইবেই হইবে। তুমি কি চাও, তাহা পূর্ব্বে স্থির কর। যদি আম বাগান চাও, বাগানে শুধু আনারসের চারা লাগাইলে চলিবে না।

(১০)

রাষ্ট্রশক্তির আর এক বড় কথা, অর্থ-বল। এখন ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন, সুখ-সাধনের জন্য অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। রাজভক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, স্বদেশে-প্রীতি থাকুক বা নাই থাকুক, অর্থের জন্য মানুষ রাষ্ট্রপতির আদেশে মানুষ-সংহার ব্যাপারে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। অর্থদ্বারা জড়-শক্তি ও পশু-শক্তি আহরণ করা যায়। অর্থদ্বারা নূতন আবিষ্কার কেনা যায়। অর্থ দ্বারা সমবেত উদ্যোগের ব্যবস্থা-বুদ্ধি কেনা যায়। রাসায়নিকের বিদ্যা কেনা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যে মানুষের প্রাণ তাহাও কেনা যায়। রাষ্ট্রপতি অর্থ-বলে লোক-বল বাড়াইয়া নিতেছেন। শুধু স্বীয় রাষ্ট্রের লোকশক্তি অর্থবলে আহরণ করিতেছেন এমন নয়, পররাষ্ট্রের মানুষকেও অর্থদ্বারা বশীভূত করিতেছেন। অর্থ দ্বারা রাজভক্তি ও স্বদেশ প্রীতিও কেনা যায়। "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে"—একথা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যতটা সত্য ছিল, এখন তার চেয়ে বেশী বই কম সত্য নহে। তাই বলিতেছিলাম, অর্থবল বড় বল।

একাকী রাষ্ট্রপতি বা তাহার জনকয়েক অমাত্য বা পার্শ্বচর অর্থোপার্জ্জন করিলে রাষ্ট্রের অর্থবল হয় না। রাষ্ট্রের জনসাধারণ ব্যবসায়, বুদ্ধি, কারিকরী নৈপুণ্য ও শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জন করিলে, তবে রাষ্ট্র-সেবায় অর্থ মিলিবে। প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থ-বল।

এক সময় শুধু মাংসপেশীর শক্তি দ্বারা শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন হইত। মানুষের বা পশুর মাংসপেশীর শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে তখন অনেক বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত, যথা—মিশরের পিরামিড্‌, দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দির। তারপরে, জলের প্রবাহ ও বাতাসের শক্তির সাহায্যে মানুষ শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার পর, বাষ্পীয়-চালক-যন্ত্রের প্রচলন; ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। এখন মাংসপেশীর শক্তির

স্থানে আসিয়াছে, জলীয় বাষ্প-শক্তি (steam), তড়িৎ-শক্তি (electricity), বিস্ফোরক-বাষ্প-শক্তি (explosive gas)। একমাসের পথ মানুষ এখন একদিনে যাইতেছে। সমুদ্র পার হওয়া এখন সহজ হইয়াছে। জল ও স্থল যে শুধু মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহা নয়। দেখিতে দেখিতে, আকাশও মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়া আসিতেছে। এই নবাবিষ্কৃত শক্তি ও যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বে যে দেশে শ্রম ও বুদ্ধি দ্বারা হাজার টাকা উপার্জ্জন হইত, এখন সে দেশে তাহার স্থানে লক্ষ টাকা অর্জ্জিত হইতেছে। এই সব শক্তি ও কলের সাহায্যে প্রভূত ধন উৎপন্ন হইতেছে। আর রাষ্ট্রের উৎপন্ন ধন, প্রয়োজন হইলেই আসিয়া, রাষ্ট্র শক্তিকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

নবাবিষ্কৃত এই সকল শক্তি ও কলের সাহায্য ব্যতীত পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জন হয় নাই বা এখন হইতে পারে না, এমন যেন কেহ মনে না করেন। কিন্তু বাষ্পীয়-চালক যন্ত্রের প্রচলনের ফলে, অর্থোপার্জ্জনের পুরাতন পদ্ধতিতে ও এই নূতন পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিযোগিতায় মাংসপেশীর শক্তি নিশ্চয়ই জলীয়-বাষ্প-শক্তি, তড়িৎ-শক্তি ও বিস্ফোরক-বাষ্প-শক্তির নিকট হার মানিয়াছে। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, পাশব-বল দ্বারা বিদেশী আমাদিগকে পরাজিত করিয়া, আমাদিগের শিল্প ও সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়াছে। যাহারা আজও ইউরোপীয় জাতির নিকট পরাজিত হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারায় নাই, তাহাদিগেরও শিল্প ও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতায় লোপ পাইতেছে। ইহা শুধু পাশব বলের বা রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ফল নহে। ইউরোপীয় জাতিগণ তাহাদিগের শ্রম-ব্যাপারে শ্রম বিভাগ (division of labour) নীতি সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া ও বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের (organisation) ব্যবস্থা করিয়া, এই সকল নবাবিষ্কৃত শক্তি ও কলের সাহায্যে, আমাদিগের পুরাতন মাংসপেশীর শক্তিকে ও কারিকরী নিপুণতাকে পরাস্ত করিয়াছে। এই যে অর্থোপার্জ্জন ব্যাপারে পরাজয়, ইহা শুধু পাশব-বলের প্রাধান্যের ফল নয়। শ্রম-বিভাগ (division of labour) ও বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের ব্যবস্থা (organisation)—এই দুইটাই ইউরোপীয় জাতি সমূহের চেষ্টার সফলতার মূল কারণ। এই দুই মূলমন্ত্র লইয়া তাহারা নবাবিষ্কৃত শক্তি ও কলের সাহায্য অর্থোপার্জ্জনে এশিয়াকে দূরে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। এসিয়ার যে সকল রাষ্ট্র এই দুই মূলমন্ত্রের ও এই সকল নবাবিষ্কৃত শক্তির ও যন্ত্রের সাহায্য লইয়া অর্থশালী হইতে পারে নাই, ইউরোপীয় রাষ্ট্র সকলের তুলনায় তাহারা হীনশক্তি ও দুর্ব্বল।

প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থবল। কিন্তু প্রজার শ্রমলব্ধ অর্থে রাষ্ট্রপতির অংশ কতটা? দেবতার অংশরূপে পূজিত বলিয়াই হউক বা অপর কোনও কারণেই হউক, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তেমন প্রতিপত্তি থাকিলে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের জন্য কোনও এক শ্রেণীর প্রজার সঞ্চিত সর্ব্বস্ব, রাজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে। ইতিহাসে, সময়ে সময়ে এরূপও ঘটিয়াছে। যেমন, পুরাতন ইংলণ্ডের য়িহুদী-প্রজার বেলায়। কিন্তু, এরূপ অব্যবসায়ী রাষ্ট্রপতি সচরাচর দেখা যায় না। প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থবল বাড়াইতে হইলে, রাষ্ট্রপতিকে বুদ্ধিমান্ সংবণিক হইতে হয়। সংবণিক তাহার খরিদ্দারের সর্ব্বনাশ চায় না। সে চায় উত্তরোত্তর খরিদ্দার সমৃদ্ধিশালী হউক। আর বণিকও, বৎসরের পর বৎসর খরিদ্দারের সহিত কারবার করিয়া, নিজে অর্থলাভ করে। যে

বণিক, একবৎসর মাত্র অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায়, প্রবঞ্চনা দ্বারা বা অপর অসদুপায়ে, খরিদ্দারের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে, সে বণিক বিষয়-বুদ্ধি শূন্য। বণিকের বেলায় যেমন, রাষ্ট্রেও তেমনি। রাষ্ট্রপতিতে ও প্রজাতে সহযোগিতা না থাকিলে, প্রজার অর্থ দ্বারা রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।

বিনা অর্থবলে রাষ্ট্র যে শক্তিশালী হইতে পারে না, ইহা রাষ্ট্রপতি যেমন জানেন, প্রজাও তেমনই জানে। আধুনিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ-শক্তিতে প্রজা-শক্তিতে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, প্রজা যখন রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চায়, তখন প্রজা-শক্তির নজর পড়ে, সর্ব্ব প্রথমে রাষ্ট্রপতির অর্থবলের উপর। রাষ্ট্রপতির অর্থবল প্রজাদিগের বা প্রজা প্রতিনিধিদিগের আয়ত্তাধীন করিবার জন্য তখন প্রজা-শক্তির চেষ্টা চলে। রাষ্ট্রের অর্থবল আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে, অনেক ব্যাপারে প্রজা-প্রতিনিধিগণ কার্য্যতঃ রাষ্ট্রপতির সমান প্রতি-শক্তিশালী হয়। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তির দ্বন্দ্ব তখন এই দুইটি কথায় আসিয়া দাঁড়ায়,—প্রথম, রাজস্বের পরিমাণ কে নির্ণয় করিয়া দিবে? দ্বিতীয়, নির্ণীত রাজস্ব কাহার ইচ্ছানুযায়ী ও কোন্ কোন ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে? আধুনিক ইতিহাসে এই দুই প্রশ্নেই প্রজার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। প্রজার অর্জ্জিত অর্থের কত অংশ রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রপতি রাজস্ব বলিয়া দাবী করিবেন, তাহা প্রজা বা প্রজা প্রতিনিধি স্থির করিয়া দেয়। প্রজা তাহার প্রতিনিধি দ্বারা সম্মতি জানাইলে, তবে রাষ্ট্রপতি রাজস্ব (tax) দাবী করিতে পারিবেন। আগে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন, পরে, রাজস্বের দাবী (no representation, no taxation)। তারপরে মনে কর, প্রজা প্রতিনিধিগণ বলিয়া দিল, এ বৎসর রাষ্ট্রপতি এক কোটী টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া ব্যয় করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন ব্যয় হইলে, এই এককোটী টাকার কিছুটা প্রজার হিতে, আর কিছুটা হয়ত প্রজার অনিষ্টকর ব্যাপারেও ব্যয়িত হইতে পারে। এখানেও প্রজা-প্রতিনিধিগণ বলিয়া দেয়, এই এক কোটী টাকার, এক নির্দ্দিষ্ট অংশ এই নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে, অপর নির্দ্দিষ্ট অংশ অপর এক ব্যাপারে, ও বাকী টাকা অপর কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে—ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। এই যে অধিকার—রাজস্ব-ব্যয়ের বাবদ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার অধিকার (appropriation of supplies)—ইহা এক বড় অধিকার। রাষ্ট্রের অর্থবল এই দুই প্রকারে প্রজাশক্তির আয়ত্তাধীন হইলে, রাষ্ট্রপতির প্রজার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার আর সম্ভবপর হয় না।

(১২)

দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচার, সহায় সম্পদ্হীনের উপর প্রতিপত্তিশালীর অত্যাচার, রাষ্ট্র হইতে দূর করিবার জন্য, সভ্যতার শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত, নানা প্রকারের চেষ্টা চলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আজ পর্য্যন্ত মানুষ যত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, অনেক স্থলেই তাহাতে বৈষম্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। চেষ্টা হইয়াছে, তাহার কুফল নিবারণ করিবার। ধনের বৈষম্য, শক্তির বৈষম্য, প্রতিপত্তির বৈষম্য আছে, থাকুক্। তাহার কুফল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বৈষম্য মানিয়া লইয়া, তাহার কুফল নিবারণ করিবার চেষ্টায়, রাজাকে পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, মন্ত্রী, মন্ত্রীকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে, হস্তী, অশ্ব ও নৌসেনা, আবার তাহাদের গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে, বড়ের দল। ফলে, বড়ের কিস্তীতে মাৎ হইবার সম্ভাবনা, রাজার কপালেও সময়ে সময়ে থাকে। সভ্য রাষ্ট্রে বৈষম্য মানিয়া নিয়া, অত্যাচার নিবারণ করিবার নানাপ্রকার চেষ্টার মধ্যে কয়েকটার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর সেই কর্ত্তব্য ভার ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সেই ক্ষমতা-প্রাপ্ত লোকেরা—অপর প্রতিপত্তি শালী লোকের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ হউক, বা প্রতিপত্তি-হীনের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ হউক, বা ন্যায় ও সাম্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই হউক,—নিজেরা পরস্পরকে সামলায়। একদল ক্ষমতাশালী লোক, অপরদল ক্ষমতাশালী লোককে তেমন বাড়িয়া উঠিতে দেয় না। পরস্পর, একে অন্যের গায়ে হেলিয়া, প্রত্যেকে অপরকে সোজা রাখে। এই কিস্তির পর কিস্তি ও পরস্পরের মাৎ সাম্‌লাইবার চেষ্টায়, অনেক শক্তি ও প্রতিপত্তির অপচয় হয় বটে, কিন্তু শক্তি-হীনের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা ইহাতে কমিয়া যায়।

রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যগুলি প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়—(১) ব্যবস্থা-প্রণয়ন (legislative), (২) শাসন (executive), ও (৩) বিচার (judicial)। ইহাতেই সভ্য-রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য শেষ হয় না বলিয়া, আরও দুই একটী শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছে, যথা—(৪) ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার প্রধান অঙ্গের পরিদর্শন ও পোষণ, (৫) অর্থবল লাভের চেষ্টায় সহায়তা (public economy)। ক্ষমতা বৈষম্য-জনিত অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য, সভ্য-রাষ্ট্রে যাহাদের হাতে শাসন বা পুলিস বা সৈন্যের ভার থাকে, তাহাদের হাতে সাধারণ প্রজার বিচার-ভার রাখা হয় না। ক্ষমতার বৈষম্য যদি রাষ্ট্রে থাকিবেই, প্রজার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, এই শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ পৃথক করা (separation of judicial and executive functions) নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু এতো গেল বৈষম্য মানিয়া নিয়া, তাহার কুফল নিবারণের চেষ্টা। বহু শতাব্দী হইতে মানুষ আর এক পন্থার কথা ভাবিয়াছে। তাহা বৈষম্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া, অত্যাচারের সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত বিলোপ করা। ধন বৈষম্যের মূলে পৃথক্ সম্পত্তির (private property) ব্যবস্থা। পৃথক্-সম্পত্তি যদি জন-সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে বুঝি আর ধনী দরিদ্রের পার্থক্য এ পৃথিবীতে থাকিবে না। পৃথক্-সম্পত্তি (private property) সমাজে যদি থাকিতে দেও, তবে ধন-বৈষম্য থাকিবেই। ধন-বৈষম্য থাকিলে, তাহার ফল—দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার—আপনা আপনিই আসিয়া দেখা দিবে। সুতরাং, অত্যাচার দূর করিতে চাও, ত মূলে কুঠারাঘাত কর; পৃথক্-সম্পত্তি মানব-সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেও। এ জমি আমার, ঐ জমি তোমার, অপর জমি আর একজনের, এ ব্যবস্থা থাকিতে দিও না। সেই সভ্যতার শৈশবে যেমন সকল জমি সকলের ছিল, সেই ব্যবস্থা আবার ফিরাইয়া আন। শুধু জমি লইয়া নয়। ধনও এতটা আমার, আর অতটা তোমার, এরূপ থাকিতে দিও না। সব ধন সকলের। প্রয়োজন-মত লোকে ভোগ করিবে। সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

প্রত্যেককে শ্রম করিয়া শ্রমার্জ্জিত ধন ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে, কিন্তু কেহ নিজের জন্য ধন-সঞ্চয় করিতে পারিবে না। আর উপার্জ্জকের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র বা কন্যা যে উপার্জিত ধন ভোগ করিবে, তাহাও হইতে পারিবে না। পৃথক্-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারিত্ব (inheritance) দূর করিয়া দেও। মূলধনের (capital) সঙ্গে সঙ্গে সুদ (interest) দূর করিয়া দেও। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য প্রজা প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দেও। সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থা (parliamentary government) চলুক। কিন্তু, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য দূর করিবার জন্য পৃথক্-সম্পত্তি দূর কর। আর ইহার জন্য প্রয়োজন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ। মানব-সমাজে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ, এই পৃথক্-সম্পত্তির ব্যবস্থা বজায় রাখা। দরিদ্রের, কৃষকের, শ্রমজীবীর স্বার্থ, এই পৃথক সম্পত্তির ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া। সুতরাং, চাই এই দুই শ্রেণীতে যুদ্ধ (class war)। ভদ্রলোকের' বিরুদ্ধে দরিদ্র—যাহাদিগকে 'ভদ্রলোকেরা' বলে 'ছোট লোক'—তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর। ঐ দেখ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, তোমার শ্রম-লব্ধ অর্থে পরিপুষ্ট 'ভদ্রলোক' তোমাকে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া, নিজে পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করিতেছে। এ যুদ্ধে খোয়াইবার তোমার কি আছে? তোমার আছে বলিতে, শৃঙ্খল। খোয়াইলে খোয়াইবে, শুধু তোমার ঐ শৃঙ্খল। ওঠ, জাগ, 'ভদ্রলোকের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা কর, শৃঙ্খল-মুক্ত হও। সমাজ-তন্ত্র-বাদীর (socialist) এই আহ্বান।

রাষ্ট্রে বৈষম্য মানিয়া লইয়া, তাহার কুফল নিবারণের চেষ্টার পন্থার কথা বলিয়াছি। এ পথে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিস্তীর পর কিস্তী, একদল ক্ষমতাশালী লোক, অপর ক্ষমতাশালী দলকে দোরস্ত রাখে (check-and-balance-system)। তারপরে বলিলাম, সমাজ-তন্ত্র-বাদীর পন্থা, বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রে ও সমাজে বল বা শক্তি (force) রহিয়া গেল। এবার একদল বলিতেছেন যে, বল বা শক্তিকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, তবে অত্যাচার থামিবে।

রাষ্ট্রের রাজ শক্তি একজন বংশানুক্রমিক রাজার হাতে ন্যস্ত থাকুক বা লোক-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে কয়েক বৎসর মাত্র ন্যস্ত থাকুক, অল্প সংখ্যক অভিজাতের বা নায়ক পিতৃগণের হাতে ন্যস্ত থাকুক, বা বহুসংখ্যক নির্ব্বাচিত সঙ্ঘ-বদ্ধ প্রজা-প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত থাকুক, বল বা শক্তি বাদ দিলে রাষ্ট্র টেকে না। রাজ-তন্ত্রই বল অভিজাত তন্ত্রই বল, আর গণ তন্ত্রই বল,—বল বা শক্তির হাত এড়াইবার উপায় নাই।

তবুও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজ অন্ততঃ ২২০০ বৎসর চলিয়াছে। কোনও প্রকার শক্তি-প্রতিষ্ঠিত শাসন থাকিবে না, একথা মানবের দু দশ বৎসরের নূতন খেয়াল নহে। বহু পুরাতন দাবী। রাজ-তন্ত্র, গণ-তন্ত্র—কোথায়ও সকলের সম্পূর্ণ সম্মতি লইয়া শাসন হয় না। কোথায়ও বা অল্পের সম্মতি লইয়া, এক বা একাধিক জন রাষ্ট্র-শাসন করে। কোথায়ও বা বহুর সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন চলে। অধিকাংশের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন পুরাকালে বড় একটা ছিল না। আমাদের দেশে, আজও অল্পাংশের সম্মতি লইয়াই রাষ্ট্র-শাসন চলিতেছে। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, যে সব রাষ্ট্র স্বাধীন, তাহাতে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে

রাষ্ট্র-শাসন হয়। দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্, ইংলণ্ডে নির্ব্বাচিত প্রজা-প্রতিনিধি দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় যাহারা ভোটে পরাস্ত হয়, তাহারা, ও যাহাদের আদৌ ভোট্ নাই, এই দুই দলের মোট সংখ্যা অনেক সময় ভোটে জয়ী দলের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং, নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলেও, স্বাধীন রাষ্ট্রে পর্য্যন্ত অনেক সময় অল্পাংশের সম্মতি লইয়াই অধিকাংশের শাসন চলে। অরাজক বাদী (anarchist) বলে যে, হয়, রাষ্ট্রে শাসন থাকিবে না, নয়,—সেই একই কথার ভিন্নরূপ—রাষ্ট্রের প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শাসন করিতে হইবে। তাহা হইলে আর বল বা শক্তির আধিপত্য থাকিবে না।

অরাজক-সমাজ (anarchy) বলিতে, বোমা-ছোড়া বা গোপনে প্রাণনাশ বুঝিতে হইবে না। অরাজক-সমাজের আদর্শ যাহারা প্রচার করে, তাহারা বল বা শক্তিকে (force) রাষ্ট্র হইতে বিদায় করিতে চায়। তাহারা নিজেও বল বা শক্তির শরণাপন্ন হইতে চায় না।

এই বল-বিবর্জ্জিত আদর্শের মূর্ত্ত-প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রে বা সমাজে দেখা যায় নাই। প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন পৃথিবীতে আজও দেখা যায় নাই। মার্কিন ভূমি হইতে দাসত্ব দূর করিবার জন্য, যুক্ত রাজ্যে, প্রজার রক্তে যখন দেশ প্লাবিত হইতেছিল, মহাপুরুষ এব্রাহাম লিঙ্কন্ যখন যুক্ত-রাজ্যে স্বাধীনতার নূতন আবির্ভাবের কথা বলিতে বলিতে দিব্য-চক্ষে মর্ত্ত-স্বরাজ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—"জনগণেরই হিতার্থে, জনগণ দ্বারা জনগণের শাসন" ("government of the people, by the people, for the people") রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—তখন তিনিও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, রাষ্ট্রীয় জনগণের প্রত্যেকের সম্মতি না পাইলে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

। পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ-বাদ—দ্বাদশ শতাব্দী।

Scholasticism

সেণ্ট অ্যান্‌সেল্‌ম যখন ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান যাজকের পদে উন্নীত হন, তখন পণ্ডিত-সমাজে বাস্তব-বাদ (realism) ও নাম-বাদ (nominalism) লইয়া যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল, সেই আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবেই যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের চার্টার (Chartres) ও প্যারী নগরে কতকগুলি তত্ত্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত নগরের তিনটি বিদ্যালয় বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদের অন্তর্ভূত হয়। আন্দোলনের মূল আলোচ্য বাস্তব-বাদ ও নাম-বাদের বিরোধ হইলেও, এই দুই মতের আবার বিভিন্ন শাখা দেখা দেয়।

সুপ্রসিদ্ধ পিটর্ আবিলার্ড (Abelard) গোঁড়া বাস্তব-বাদের (extreme realism) প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এক দিকে যেমন বিভিন্ন দলের বিবাদ, অন্যদিকে তেমনি, বিবাদের ফলে, নব নব মতের আবিষ্কার ও সঙ্কলন আরম্ভ হয়। যাহারা এই নবাবিষ্কৃত মত সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে সলসবেরীর জন্ এবং লাল নগরীর আলানের (Alan) নাম উল্লেখ-যোগ্য।

উল্লিখিত শাখা-সমূহের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক যোটাস ঈরিগিনার অনুকরণে খ্রীষ্টীয় আদর্শ-বাদের বিপক্ষতা করিতেছিলেন। এই দলের প্রায় সকলেই সর্ব্বভূতে দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। অপর এক দলের লোক (১) অর্থাৎ ক্যাথেরী (Catheri) আলবিজেন্সী (Albigenses) নামক দুই বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের নির্য্যাতনে নিযুক্ত ছিলেন, প্রাচীন এপিকিউরীয় দিগের ন্যায় (২) ঐহিক সুখ-সম্ভোগের প্রতি তাহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। তৃতীয় এক দলের লোক কঠোর ধর্ম্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করায় ধর্ম্মতত্ত্বেরও (Theology) উন্নতি হইয়াছিল।

গোঁড়া বাস্তব-বাদ (extreme realism)—দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ, গোঁড়া বাস্তব-বাদের প্রাধান্য কাল। এই মতের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে জাতি-বাচক এবং শ্রেণী-বাচক যাবতীয় জ্ঞানের মূলে এক সার্ব্বজনীন সত্তা নিরূপিত হইলেও, সেই সত্তায় যাবতীয় বস্তুর মিলন-গ্রন্থি-রূপ ঐশ্বরিক-ঐক্য (pantheistic unity) সূচিত হয় না। যে সকল বিশেষত্ব লইয়া 'জাতি', 'শ্রেণী' ও 'ব্যক্তি' বিশেষিত হয়, সেই বিশেষত্বগুলি সার্ব্বজনীন সত্তারই অঙ্গ-স্বরূপ (Cf Plato's Ideas), অথচ তাহাদের ভিতর ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব নাই, সেগুলি যেন প্রাণহীন, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-রহিত। এরূপ মতকে ভ্রান্ত-মত বলিতে হইবে। সার্ব্বজনীন সত্তা যদি যাবতীয় বস্তুর মূল কারণ বা ভিত্তি হয়, তবে আর তাহাতে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব আরোপ করিতে আপত্তি কি? এই সময়ের বাস্তব-বাদ সংক্রান্ত মতাবলী মোট দুই প্রধান ভাগে বিভাজ্য। প্রথম, সাম্পোর উইলিয়মের মত, এবং দ্বিতীয়, চার্টার বিদ্যালয়ের মত।

---

(১) ইঁহারা পোপ Innocent III ও তাঁহার অনুচরবর্গ। ইনোসেণ্ট "হেরেটিক" বা ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের উচ্ছেদ-সাধন কল্পে যে অভিযান করিয়াছিলেন, ও তাহার ফলে পশ্চিম-ইউরোপ-খণ্ডে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ-মাত্রেই অবগত আছেন। Albigenses-সম্প্রদায় বা Albigeois দিগের উচ্ছেদ সম্বন্ধে Prof. Bury তাঁহার History of the Freedom of Thought গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"Langnedoc in south-western France was largely populated by heretics, whose opinions were considered particularly offensive known as the Albigeois. They were the subjects of the Count of Toulouse, and were industries and respectable people. But the Church got far too little money out of this anti-clerical population, and Innocent called upon the Count to exterpate heresy from his dominion."—p. 56 (Home University Edition.)

(২) গ্রীক-দর্শন, ১৩২-১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১। সাম্পোর উইলিযম্ (William of Champeaux)

সাম্পোর উইলিয়ম খ্রীষ্টীয় ১০৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমান্বয় সালেঁার বিশপ-পদে (Bishop of Chalons) প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

যৌবনে তিনি লেঁয়র বিদ্যালয়ে অধ্যাপক আন্সেলমের (Anselm of Laon) নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং বহুদূর হইতে শিক্ষার্থিগণ তথায় সমাগত হইতেন। উইলিয়ম যখন ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর ক্যাথেড্রাল বিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি একবার গুরু বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। কিন্তু পরে, তাঁহারই শিষ্য, পিটর্ আবিলার্ড, কর্তৃক কঠোররূপে আক্রান্ত হইয়া, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফল পাইয়াছিলেন।

উইলিয়ম "ডায়ালেকটিকৃস্" সম্বন্ধে অনেক গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিলেও, সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশই এইক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে। "Sentences" নামে তাঁহার একখানি সংগ্রহ-পুস্তকও ছিল। আবিলার্ডের গ্রন্থে দেখা যায় যে, উইলিয়ম 'নাম' (universals) সম্বন্ধে স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতের প্রধান আলোচ্য বিষয় গুলি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

একত্ব বোধক মত বা Identity Theory। সার্ব্বজনীন-সত্তা তাহার অন্তর্ভূত প্রত্যেক "শ্রেণী"তে এরূপ ভাবে বিরাজিত যে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত "ব্যক্তি" সমূহেও তাহা পৃথক পৃথক ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ব্যক্তিসমূহ (individuals) শ্রেণীর বিকার (modification) এবং বিকারগুলি আকস্মিক বা দৈব সাপেক্ষ। শ্রেণী, মূল সত্তার অংশ বিশেষ। এই মত সহজেই উপহসিত হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই যদি নিখিল মানব-জাতির প্রতিনিধি হয়, তবে সমগ্র মানব-সমাজই এক কালে পূর্ণ ও একরূপ ভাবে রোমে সক্রেটিসের ভিতর এবং এথেন্সে প্লেটোর ভিতর অবস্থিত, অর্থাৎ মানব-জাতীর প্রতিনিধিরূপে সক্রেটিস, ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়াও, প্লেটোর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন বলিতে হইবে। প্লেটোর সম্বন্ধেও ঐ কথা। যতই উপহসনীয় হউক, উইলিয়ম্ যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই যে, একমাত্র সর্ব্বজনীন সত্তা ভিন্ন আর কোন বস্তুই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য নয়। মানব বলিতে একটি মাত্র সর্ব্বব্যাপী সত্তা স্বরূপ মানবই বুঝায়, আর ইহাই আদর্শ মানব, বা মানব-জাতীর রূপ। সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, দৃশ্যতঃ পৃথক হইলেও, মূলতঃ (fundamentally) এক। ইহাদের পরস্পরের যে ভেদ বা পার্থক্য, সেই ভেদ বা পার্থক্য গুলি মূল সত্তার "আকস্মিক" বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহাদের বাস্তবতা বা সারবত্তা নাই, মোটের উপর, ইহারা শূন্য-গর্ভ শব্দ বা "নাম" (*flatus voces*)। গোঁড়া বাস্তব-বাদী বা আদর্শ-বাদীর মতে প্রত্যেক জাতি-বাচক ধারণার মূলে এমন এক অখণ্ড নিত্যবস্তু কল্পিত হয় যে, সেই বস্তুর সহিত তাহার ধারণার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐক্য বা সামঞ্জস্য থাকে। বস্তুগুলি আমাদের মানস-রাজ্যের বহির্ভাগেই অবস্থিত; অর্থাৎ, তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের 'ভাবা' কিম্বা 'না ভাবা'র উপর নির্ভর করে না। যাহা হউক, আবিলার্ডের তীব্র বিদ্রূপ সহিতে না পারিয়া, উইলিয়ম্, ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে, নোটর্ডাম্

বিদ্যালয় ত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন পরে সেণ্ট্ ভিক্টর বিদ্যালয়ে অন্যরূপ মতের প্রচারে প্রবৃত্ত হন। উইলিয়মই শেষোক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

মাধ্যমিক-মত বা Indifference Theory—এই মত মধ্য-পন্থী বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেকের নিকট, বিশেষতঃ উইলিয়মের শিষ্যদিগের নিকট, বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। Indifference Theoryর অনেকেই অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "জাতি" ও "শ্রেণী" বিভাগ সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের প্রকাশক হয়ারো (M Haureau) "indifference"এর স্থলে "individuality' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মোটের উপর, কুজা (Cousins) হয়ারো'র মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই যে, একই সত্য বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকিয়াও, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ, বস্তু ব্যক্তিতে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব ব্যক্তির, individuality বা স্বাতন্ত্র্যের অনুরূপ। যে ব্যক্তিতে যতটুকু স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর, তাহাতে ততটুকু সত্তাই প্রকটিত হয়। এই মত যতই আদরনীয় হউক, এখানেও আবিলার্ড শত্রুতা সাধিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

সদৃশ-মত বা Similarity Theory—এই মতে, বস্তুর সার 'ব্যক্তি'তে (individualএ) বিবর্ত্তিত ও বিবর্দ্ধিত (multiplied) হইলেও, বিবর্দ্ধিত-সার-সমূহের পরস্পরের "সাদৃশ্য" নষ্ট হয় না, অর্থাৎ, সাদৃশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়। ইহার ফলে, এক জাতীয় যাবতীয় জীবের 'জাতি'গত স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে।

এস্থলে গোঁড়া বাস্তব-বাদের পরিবর্ত্তে বরং রস্কেলিনের, এমন কি প্রকারান্তরে আবিলার্ডের, যুক্তিই সমর্থিত হইতেছে।

উইলিয়মের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তনের আসল কারণ এই যে, তিনি আবিলার্ডের বিচারে পরাস্ত হইয়া, অবশেষে তাঁহার মতই অবলম্বনীয় মনে করিয়াছিলেন।

২। চার্টার বিদ্যালয়।

বার্ণার্ড্ (Bernard of Chartres)

ফুল্বার্ট (Fulbert) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চার্টার বিদ্যালয়, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া বাস্তব-বাদের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। চার্টারের বার্ণার্ড্ ব্যতীত, মেলান ও টুর্সের আরও দুইজন বার্ণার্ড্ ছিলেন, তাঁহাদের সহিত বক্ষ্যমান বার্ণার্ডের সম্বন্ধ নাই।

চার্টার বিদ্যালয়ে যে কয়জন প্রধান অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বার্ণার্ড্ই সর্ব্ব-প্রথম। ইহার শ্রোতাদিগের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যথা, ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে, গিল্বার্ট ডে লা পরী (Gilbert de la Porree), এবং ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে, কঞ্চের উইলিয়ম্ ও বিশপ রিচার্ড্। ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চার্টার চার্চ্চের চান্সেলর (Chancellor) পদলাভ করেন, এবং ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

বার্ণার্ডের মতে জাতি-বাচক ও শ্রেণী-বাচক বিশেষত্ব গুলি (generic and specific essences) ত ভিত্তিহীন হইতেই পারে না। অধিকন্তু, ব্যক্তিগত আকস্মিক গুণ গুলিরও

(accidents) মূলে বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সার্ব্বজনীন-সত্তা-সমূহ বিদ্যমান আছে বলিয়াই, জীবের অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে। নচেৎ, কেবল ইন্দ্রিয়জ সংস্কারের আর স্থায়িত্ব কি? সেগুলি ত ছায়ার মত চঞ্চল ও অসার। মধ্যযুগের এই মতের সহিতই প্রাচীন যুগের আদর্শ বাদের (Plato's Idealism) সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। বার্ণার্ড্ অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান ও পৃথক স্তর দেখিতে পান। (১) ঈশ্বর,—মহান্ ও অনন্ত সত্তা। (২) জড়,—(matter), যাহার নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, পরন্তু, যাহা ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতার ফল-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া, আদর্শ কর্তৃক দৃশ্যমান জগতে পরিণত হইয়াছে। (৩) আদর্শ বা বস্তুগত রূপ সমূহ—যদ্দ্বারা নিখিল সৃষ্টি ভূত ভবিষ্যৎ কাল নির্ব্বিশেষে অনন্ত প্রজ্ঞার গোচর রহিয়াছে। বার্নাড্ কি প্রকারে এই তিন পর্য্যায়ের পরস্পরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। তদ্দায় ঐতিহাসিক সল্স্‌বেরীর জন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সময়ে সময়ে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন ঘটিত। তিনি কখনও এক পক্ষে নশ্বর দ্রব্য নিচয়ের সমষ্টিরূপ ইন্দ্রিয় জগৎ, এবং অপর পক্ষে, ঈশ্বরের অন্তর্লীন-ভাব (immanency) বা আদর্শ সমূহ, এই উভয়ের সংযোগ সূত্র-রূপে এক তৃতীয় সত্তা বা স্বাভাবিক রূপ (*forma nativa*) কল্পনা করিয়াছিলেন। এই স্বাভাবিক রূপ বা মিলন-গ্রন্থি, অনন্ত আদর্শের (ঈশ্বরের) প্রতিনিধিরূপে জড়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলেও, সেই আদর্শ সমূহের সহিত মিলিয়া যায় না। আবার কখনও ইহাও বলিয়াছেন যে, জড় ও আদর্শ বা রূপের মধ্যে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই; আদর্শ জড়ের সহিত মিলিয়া একীভূত হয়, অর্থাৎ জড় কিম্বা আদর্শের পৃথক সত্তা থাকে না। বার্ণাড্ যদি শেষ পর্য্যন্ত এই মতকেই অবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে সর্ব্বদেবত্ব-বাদী বা pantheistic বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু, তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত এই মতেরই পোষকতা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বার্ণাড্ সৃষ্টির উপাদান-স্বরূপ এক প্রকার আদি-জড়ের (*materia primordialis*) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। এই আদি-জড় 'স্বভাবতঃ' শৃঙ্খলা বিহীন, তবে তন্মধ্যে রূপ প্রদায়িকা-শক্তি (plastic principle) বিদ্যমান থাকায়, সেই অ-রূপ জড়, অশেষ রূপের ছাঁচে ঢালাই হইয়া, অসংখ্য অবয়ব ধারণ করিয়াছে। এই মত যে শক্তি-বাদের অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং অ্যারিষ্টটলের জড়-ও-রূপ-সংক্রান্ত মতের বিরোধী। (৩) বার্ণার্ডের শক্তি-বাদ, চার্টার বিদ্যালয়ের মতাবলীর মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ইহারই পাশাপাশি আর এক প্রাচীন মতের পুনরভ্যুদয় হয় এবং তাহাতে বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেবী-রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) বিশ্ব-প্রকৃতি এক বিশাল জীব-দেহ তুল্য, সুতরাং, উহা যাবতীয় পৃথক পৃথক জীব হইতে ভিন্ন এবং স্বয়ং-আত্মা বিশিষ্ট। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বাত্মার সম্বন্ধ-স্থাপন কল্পে, বার্ণার্ডের শিষ্যগণ পিথাগোরাসের কল্পিত সংখ্যা-মালার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। চার্টার সম্প্রদায়ের অনেকেই বার্ণার্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন। এবং তদীয় শিষ্যদিগের মধ্যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা থিওডোরিকের (Theodoric) সময়ে, উক্ত সম্প্রদায়ের যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

(৩) গ্রীক দর্শন, ১০৮ ও [illegible] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৪) গ্রীক দর্শন, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

থিওডোরিক (Theodoric)।

থিওডোরিক "মাজিষ্টার শ্রাল" (*magister* [illegible]) বা প্রধান অধ্যাপক [illegible] তিনি ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এই সময়ে স্যালিসবেরীর জন তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে, চার্টারে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের 'চান্সেলর' হন, এবং তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎ প্রণীত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে "Eptateuchon" বা সপ্ত-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট।

চার্টারে যে সকল বিষয় অধীত হইত, তন্মধ্যে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্ক শাস্ত্র, এই ত্রিবিদ্যা বা "ট্রিভিয়াম" (*Trivium*)-এর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর ছিল। পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে এবং লাটিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার হয় না। 'এপ্টাটিউকন্'-গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল-কৃত "অর্গাননে"র অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই গ্রন্থ হইতেই পশ্চিম ইউরোপে অর্গাননের প্রচার হইয়াছিল। থিওডোরিক যে কিরূপে "অর্গাননে"র অংশগুলি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। 'এপ্টাটিউকনে'র আবিষ্কর্ত্তা ক্লার্ভাল (M Clerval) এ সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। মোটের উপর, থিওডোরিক তাৎকালিক পাণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে ও সামঞ্জস্য-বিধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই থিওডোরিকের নিকটই দালমেটিয়ান্ হর্ম্যান্ কর্ত্তৃক, ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, টোলেমীর 'প্লেনিস্ফিয়ার' (Planisphere) নামক গ্রন্থের লাটিন অনুবাদ (আরবীয় সংস্করণের) প্রেরিত হইয়াছিল।

অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে থিওডোরিক সোৎসাহে ও দৃঢ়তার সহিত আদর্শ-তত্ত্বের বিচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই আদর্শ-বাদ চার্টার বিদ্যালয়ের অবনতি-কাল পর্য্যন্ত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্লার্ভাল্ ও হ্যারো প্রভৃতির মতে, তিনি গোড়া আদর্শ-বাদ ও সর্ব্বদেবত্ব-বাদের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান, তাহাও ভেদ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যাহাই বলুন, থিওডোরিক কিন্তু অতটা অগ্রসর হন নাই। ঈশ্বরের অনন্ত প্রভাব এবং স্রষ্টার উপর সৃষ্টির একান্ত নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল রচনা আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে সতর্কতা আবশ্যক। "অনন্ত এক" হইতে "সান্ত অনেকে"র উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যে পিথাগোরীয় মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাও খুব বেশি পরিমাণে নয়। ঈশ্বর একমাত্র অনন্ত মহা-সত্তা বলিয়া তিনি দুই বা বহু'র অতীত, এবং দ্বিত্ব-বোধক যাবতীয় বস্তুই অনন্ত একের অনুপ্রবেশ (compenetriation) ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। তাঁহার এই উক্তিরও যথাযথ অর্থ-গ্রহণ করিতে হইবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মত এই যে, নিয়মাবদ্ধ বাহ্য-জগতে ঈশ্বর সৃষ্টবস্তু-জাতের নিয়মিত অবস্থানের একমাত্র 'হেতু' হইলেও, প্রত্যেক প্রাণীরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এবং সেই স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বরেরই 'কৃত'। এই মত প্রকাশে থিওডোরিক কোন সন্দেহ রাখেন নাই। উপসংহারে বলিতে হইবে, তাঁহার চিন্তা-প্রণালী "স্কলাষ্টিক" বা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও, অ-খ্রীষ্টীয় বা "অ্যান্টি-স্কলাষ্টিক" মতের খুব কাছাকাছি গিয়াছিল।

"কস্‌মলজি" বা সৃষ্টি-বিজ্ঞানের বিচারে থিওডোরিক তদীয় ভ্রাতার মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ।

থিওডোরিকের শিষ্যদিগের মধ্যে রেটিনার (Retines) রবার্ট, ডালমেটিয়ান হর্ম্মান, এবং সমসাময়িক জন্‌ই সুপরিচিত।

উইলিয়ম্ কঞ্চ্ (William of Conches)।

উইলিয়ম্ কঞ্চ্ (১০৮০-১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) বার্ণার্ডের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। "হিউম্যানিজম" (Humanism) বা সাহিত্য-সেবায় এবং জড়-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে চার্টারের মতের পরিপোষক বলিয়া গণ্য করা হয়। প্যারী নগরে কিছুকাল অধ্যাপনার পর, তিনি রাজা হেন্‌রীর (Henry Plantagenet) গৃহ-শিক্ষক হইয়াছিলেন। প্লেটোর "টীময়াস"-গ্রন্থ এবং "ডি কন্‌সোলেশিওনি ফিলজফী" নামক গ্রন্থের বর্ণনাংশ উদ্ধার সাধন ব্যতীত, তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে—'Magna de Naturis Philosophia," "De Philosophia Mundi প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকখানি কখনও কখনও বীডের রচিত বলিয়া উক্ত হয়।

প্রথম জীবনে উইলিয়ম্ গোড়া বাস্তব-বাদের দিকে অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন, এমন কি, ধর্ম্মতত্ত্বে পিথাগোরাসের মত প্রয়োগ করিতে গিয়া, খ্রীষ্টের আত্মাকে (Holy Ghost) বিশ্বাত্মারূপে দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সেণ্ট্ থিওডোরিকের উইলিয়ম্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তিনি এই অদ্ভুত মতের প্রত্যাহার করেন এবং তৎপরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

চার্টার বিদ্যালয়ে অন্যান্য শাস্ত্র-সমূহের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্রও বিশেষভাবে আলোচিত হইত। এই সময়ে চিকিৎসক (Alexander) আলেকজাণ্ডারের "De Arte Medica" বা চিকিৎসা বিদ্যা, "ইসাগোগ্ জোহানিটি" (Isagoge Johanitie) হিপাক্রেটিসের মূল সূত্র-সমূহ (Aphorisms of Hippocrates) ফিলারিটাসের "ডি পল্‌সিবুস্" (De Pulsibus), থিওফিলাসের "ডি ইউরিনিস্" (De Urinis), কনষ্টাণ্টাইনের "থিওরিকা" (Theorica) এবং গ্যালেনের উপর লিখিত ভাষ্য সমূহ একমাত্র চিকিৎসা-গ্রন্থ-রূপে ব্যবহৃত হইত। কনষ্ট্যাণ্টাইনের পুস্তক সাহায্যে, উইলিয়ম গ্যালেন ও হিপক্রেটিসের শারীর-বিদ্যা সংক্রান্ত অনুমান-সমূহ অবগত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল অনুমানের সহিত স্নায়বিক জ্ঞানের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টাইনই পশ্চিম প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত দৈহিক পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য প্রচার করেন। সেই হইতে এ বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ায়, মানসিক বৃত্তিগুলির চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। বাথের অ্যাডিলার্ড্ (Adelard), সেণ্ট্ থিওডোরিকের উইলিয়ম্ (William of St. Theodoric), হিসিউর উইলিয়ম্ (William of Hirschau) এবং আরও অনেকে, সম্বিৎ-উৎপাদনে মানসিক-ক্রিয়ার অপেক্ষা, স্নায়বিক ক্রিয়ার প্রাধান্য অধিক স্বীকার করিতেন।

সৃষ্টি-বিজ্ঞান (Cosmology) সম্বন্ধে চাটার বিদ্যালয়ের অপর দুইজন অধ্যাপকের সহিত উইলিয়মের মতের মিল ছিল না। সৃষ্টিতত্ত্বে তাঁহারা শক্তির কার্য্যকারিতায় বিশ্বাস করিতেন; উইলিয়মের মত পরমাণু-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা এই চারি উপাদান পরস্পর সমধর্ম্ম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জড়কণা সমূহের সম্মিলনে উৎপন্ন। কণাগুলি সহজেই চালিত ও মিলিত হইয়া অবয়ব প্রাপ্ত হয়। স্বভাব-জাত যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত-জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট মানব-দেহও, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, আত্মাই যে দেহ-গঠনের মূল কারণ—আত্মা হইতেই যে দেহ রূপ প্রাপ্ত হইতেছে, এরূপ বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। তবে যে উইলিয়ম্ বিশ্বাত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে কেবল চাটার বিদ্যালয়ের সংস্রব-বশেই করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম্ কঞ্চের অপর একখানি পুস্তকের নাম Summa Moralium Philosophorum বা "মর্যাল্ ফিলজফি"র সংগ্রহ। ঐতিহাসিকেরা এই পুস্তককে মধ্যযুগের নীতি-শাস্ত্র বিষয়ক প্রথম-গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ইহার বক্তব্যগুলি প্রধানতঃ সেনেকা ও সিসিরো হইতে গৃহীত হইয়াছিল। প্রকৃত নীতি-শাস্ত্র বা নীতি বিজ্ঞান (Ethics) যাহাতে মানব-চরিত্রের প্রকৃতি এবং মানবের চরম উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই।

সর্ব্বদেবত্ব-বাদের অভ্যুদয় (Dawn of Pantheism)।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বদেবত্ব বাদ ও গোঁড়া বাস্তব-বাদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই; এবং থিওডোরিকের মতের সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে পরিণত হইতে পারে। হইয়াছিলও তাহাই। বহুসংখ্যক দার্শনিক গোঁড়া বাস্তব-বাদের আলোচনা হইতে ক্রমান্বয় সর্ব্বদেবত্ব-বাদের (Pantheism) পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে, অ্যাবিলার্ড্ই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম-বিচারক-রূপে পরিগণিত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগিজয় রায়চৌধুরী।

শিক্ষা-জগতের যৎকিঞ্চিৎ।

শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে আমায় কিছু বল্‌তে বল্লেই, আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। আমি আপত্তি করাতে আমায় বলা হল—"বাঃ রে, তুমি এত যায়গায় কাজ করে এলে, তুমিই ত এ বিষয়ে বল্‌বার লোক।" আমি তখন যোড়হাত করে বল্লাম—"আজ্ঞে, কিন্তু সব জায়গায়ই যে আমায় আনাড়ি ঠাউরে, অনেকেই উপদেশ দিয়ে গেলেন, কি রকম করে শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান কাজটা সুসম্পন্ন হয়।" বাস্তবিক, আমার মনে হয়, শিক্ষকদের মত—বিশেষ করে, শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের মত—বেচারা লোক আর কেহ নাই। শিক্ষা-বিজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত অতি শৈশব অবস্থা। তার উপর এটা যে একটা বিজ্ঞান, অনেকে তাই-ই স্বীকার

করেন না। কাজেই এর উপর রাম, শ্যাম, খেঁদী, পুটী সকলেই নির্ভয়চিত্তে নিজের মত রীতিমত জাহির করে আস্‌ছেন। আমার জীবনেই ত আমি দেখলাম এ বিষয়ে যিনি যত বেশী অনভিজ্ঞ, তাঁরই তত বেশী মত দিবার প্রবল আকাঙ্খা ও চেষ্টা, এবং তাঁর মত অগ্রাহ্য হলে, তাঁর তত বেশী রাগ। শিক্ষায়তনের কর্ত্রী হয়ে আমি এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে, অল্প শিক্ষিত বাবা মা রাই নিজেদের, আমাকে আমার কাজ শেখাবার অধিকারী বিবেচনা ক'রে, ক্রমাগতই উপদেশ দিয়ে গেছেন। কলম্বোতে থাকতে দুটা তিনটা মহিলার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। তাঁরা, সময় অসময়ে শুভাগমন করে, তাঁদের উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করতেন। ছুঁচার পর ঢটা পায়ে দেওয়া, আঁচলে চাবী বাঁধা, নিতান্ত ভারতীয় এই মেয়েটার যে সাহায্যের বিশেষ দরকার, তা তাঁরা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন, বোধ হয়। কিন্তু আমি কোনও রকমে ভেবে পেতাম না যে, এদের মতকে আমি কি রকমে গ্রহণ কর্ব্ব বা প্রকাশ দোবো। এঁরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠ্‌লেন, বল্লেন, মেয়েটি বড়ই একবোখা, নিজের মত অনুসারেই চলে, কারো মত গ্রাহ্য করে না। আমি উপায়ান্তর না দেখে, একদিন জনদশেক মহিলাকে ডেকে বল্লাম—"*কলেজের কাজ,—বিশেষ করে, ছাত্রী-নিবাসের কাজ—সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কর্‌বার* জন্য আমি আপনাদের সহায়তা ভিক্ষা কর্‌ছি। আপনারা অনুগ্রহ করে আমায় আপনাদের অভিজ্ঞতার ফল দিয়ে সাহায্য করুন।" পূর্ব্ব কথিত মহিলাদের মধ্যে একজন বল্লেন,—"আপনি ত আমাদের মত গ্রাহ্যই করেন না। আমি বল্লাম—"আপনারা লিখে দিলে, আমার সেই অনুসারে কাজ কর্‌বার সুবিধা হয়, যদি অনুগ্রহ করে লিখে দেন"। আমার নম্রতায় তাদের কষ্ট-হৃদয়, বোধ হয়, পরিতৃপ্ত হল। পরদিনই তিন খানা পত্র পেলাম। একজন আমার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত, অপর দুজন তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন। এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর্‌লুম, আর কেহই মত দিলেন না। আমি চেয়ে পাঠাতে, দুই এক জন উত্তর দিলেন—"আপনার কাজ, আপনিই বুঝুন্ না কেন? আমাদের আর কি বল্‌বার আছে। আমরা, যা' হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট।" আমি আবার সবাইকে ডাকলুম, আস্‌লেন মাত্র পাঁচজন। আমি তখন সেই দুটী পত্র-লেখিকাকে তাঁদের পত্র দুটা—এককে অন্যের—পড়্‌তে দিলাম। বল্লাম—"আমি কি করে এখন কাজ করি, বলে দিন"। এ দুজন ঠিক বিপরীত মতই ব্যক্ত করেছেন। একজনের মত চালাতে গেলে, অন্যজনের মত গ্রহণ কর্‌বার উপায় থাকে না। এঁদের দুজনাকে মত নিয়ে তর্ক করবার অবকাশ দিয়ে, আমি অপর তিন জনকে নিয়ে অন্য কোনও বিশেষ কাজে মন দিলাম। ঐ দিন থেকেই আমায় সাহায্য কর্‌বার প্রবৃত্তি, এই দুটা হিতৈষিণীর মধ্যে আর ততটা পরিস্ফুট হতে দেখি নি।

আমার এক বন্ধু আমায় সর্ব্বদাই এই বদ্‌নাম দেন যে, আমি অতিশয় অসহিষ্ণু এবং ঝগ্‌ড়াটে। কিন্তু এই সমস্ত মতের অত্যাচার, আমরা শিক্ষায়তনের কর্ত্তা কর্ত্রীরা যে রকম নীরবে এবং হাসিমুখে সহ্য করে থাকি, সেটা যখন মনে হয়, তখন নিজের প্রতিই নিজের চিত্ত, শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে, সকল দেশের সকল শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের প্রতি সমবেদনায় মন পূর্ণ হয়।

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে- মেয়েদের লেখাপড়া শেখালেই তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই স্বাস্থ্য নষ্ট হবার কারণ খুঁজ্‌তে গিয়ে কতকগুলি জাজ্বল্যমান অভাব আমাদের চোখে পড়ে গেল। তার একটী হচ্ছে, মেয়েদের শরীর-চালনা

ও ব্যায়ামের অভাব। তখন স্থির হ'ল যে, ব্যায়ামের ব্যবস্থা হবে। বিদ্যালয়ের সভা-বিভাগে, সপ্তাহে দু'ঘণ্টা ড্রিলের ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু তাতেও ঠিক হয় না মনে করে আমরা জন কয়েক নূতন-ব্রতী, প্রধানাচার্য্যা ও প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে, বিদ্যালয়ের ছুটির পর ব্যায়াম-শিক্ষার বন্দোবস্ত করলাম। একটা nominal fee নেওয়াও ঠিক হ'ল। মেয়েদের বলা হ'ল বাড়ী গিয়ে বলতে বা বাড়ীর লোকদের লিখে জানাতে। কয়েক দিন পরে, প্রধান-শিক্ষক মশাই, হাতে এক তাড়া চিঠি নিয়ে ডেকে বলেন—"শুনে যাও, তুমি নূতন ব্রতী উৎসাহী। এই দেখ মজা।" অধিকাংশ চিঠি গুলির মত, একই—এই রকম ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা আমাদের দেশের মেয়েদের জাতিগত বিশেষত্ব হারাইবার সম্ভাবনা। এক একজন লিখেছেন যে, জল তোলা বাটনা বাটা, এবং বাসন মাজার কাজেই মেয়েদের ব্যায়াম করা হতে পারে। কিন্তু তাদের এটুকু মনে এল না যে, সহরে কলের জল, পাড়াগাঁয়ের পথ হেঁটে, নদী বা পুকুর থেকে জল আনার মত, এখানে জল তোলার কাজে, সে রকম শরীর চালনা হয় না। তারপর, বাটনা-বাটা বা বাসন-মাজা বিদ্যালয়ে হ'তে পারে না। এত জাতির বিচার এবং হাজার কুসংস্কারের বাধা ঠেলে, এ দেশে তা' হওয়াও সম্ভব এখন নয়। বাড়াতেও স্কুল প্রত্যাগত শ্রান্ত মেয়েটিকে দিয়ে, পারত-পক্ষে, বাবা-মা-রা ওসব কাজ করান না। একজন বাবা তাঁর কন্যাকে লিখেছিলেন—"কেন? তোরা কি সব দেবী চৌধুরাণী হয়ে উঠবি, যে, আবার ড্রিল ইত্যাদি শেখার চড় উঠেছে? ও সব করলে তোর শরীরের কোমলতা নষ্ট হয়ে যাবে, ও সব তোকে করতে হবে না।" অথচ এই ভারতবর্ষেই নৃত্য গীতের বহুল আদর ছিল এবং আজ পর্য্যন্ত বাদান্তঃপুরিকাগণ, রাজ-রাণী থেকে আরম্ভ করে সবাই ই. গাড়ী, কজরী ইত্যাদি কত নাম দিয়ে, এই ড্রিলই করে' থাকেন। আমরা তখন নূতন কাজে নতা. ব্যাপার দেখে, একেবারেই হাল ছেড়ে দিলাম।

কলাম্বোতে থাকতে আমি ছাত্রী-নিবাসের ছাত্রীদের মধ্যে শরীরের সকল অঙ্গ চালনার উপযোগী খেলার প্রবর্ত্তন করেছিলাম এবং তারা যাতে এসব খেলা নিয়মমত খেলে, সে দিকেও দৃষ্টি রেখেছিলাম। Day scholar-দেরও শ্রেণী-হিসাবে, পালা করে, খেলাতে যোগ দিবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। ছাত্রীরা অধিকাংশই খুব আগ্রহের সঙ্গেই এই নূতন নিয়মটাকে গ্রহণ করেছিল।

একদিন ম্যানেজার মশাই হঠাৎ একখানা চিঠি নিয়ে এসে বল্লেন—"তোমার নামে যে নালিশ এসেছে, মা"। একজন বাবা লিখেছেন—"আমি বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের মোটেই খেলতে দিই না। তারা স্কুল থেকে এসেই পড়তে বসে যায়" (তারপর কত ঘণ্টা পড়ে, তার এক হিসাব দিয়ে, তিনি লিখেছেন) "আর, ইঁনি স্কুলে খেলার নিয়ম করে বসেছেন। এটা কি ভাল! লেখাপড়ার সময় খেলার দিকে মন দিলে, এদের লেখাপড়া হবে না যে।" আর একটী মহিলা, রেলগাড়ীর ভাড়া খরচ করে, আমায় বলতে এসেছিলেন, তাঁর মেয়েটী খেলার সময়, কাপড়ে জরীর ফুল-তোলা বা কোনও রকম চারু-সূচী-শিল্পের কাজ করতে পারে কি না। আমি বল্লাম "না, তা' পারে না ত! এখানকার নিয়ম যে, খেলা করা।" তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন "খেলা যদি করতে হয়, তা হলে যেন তাসই খেলে। এক পাঞ্জাবী মায়ের ভয় হয়েছিল, তাঁর মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে, টেনিস কোর্টের আব্দার ধরে বসতে পারে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য-হানির আর একটা কারণ আমি পেয়েছিলাম, সেটা তাদের অসময় খাওয়া, এবং তাও, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং খাবারের পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে নয়। বিদ্যালয় থেকে এর কোনও সুব্যবস্থা করা আমাদের দেশে কঠিন, কারণ, প্রথমত, এখানে residential school বা college হওয়া সম্ভবপর নয়, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বালিকা-বিদ্যালয় গুলিকেই, ছাত্রী আনিবার বন্দোবস্ত করতে হয়। এই দ্বিতীয় কারণের জন্যই, স্কুল পড়া ছেলেদের চেয়ে, মেয়েদেরই খাওয়ার অনিয়ম বেশী হয়। কলাম্বোতে সে ঝঞ্ঝাট ছিল না, ছাত্রী আসার বন্দোবস্ত বাড়ী থেকেই করা হয়। সেই জন্য আমি সেখানে সকালে স্কুল করতাম। ডিরেক্টার ডেন্‌হ্যাম সাহেবের এই ব্যবস্থা পছন্দ হওয়াতে, তিনি সমস্ত স্কুল কলেজকে এই ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। ১১টার সময় খাবার ছুটী হ'ত। বাড়ী যাদের কাছে, তারা বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্‌ত। বাকীদের খাওয়ার বন্দোবস্ত স্কুলে করা হ'ত। কেউ ছাত্রী নিবাসে, মাসিক fee দিয়ে, সেখানকার খাবার খেতেন কারো বা বাড়ী থেকে খাবার আস্‌ত। যাদের বাড়ী থেকে খাবার আস্‌ত, তাদেরও খাওয়া আমি নিজে গিয়ে দেখ্‌তাম। একজন মা কিন্তু এই খবর শুনে বড়ই চটে উঠেছিলেন। এই দেখাটা যে আমার একটা কর্ত্তব্য, সেটা অনেকখানি বেগ পেয়েই আমায় তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল, আমি অতিকষ্টে তাঁকে শান্ত করি। বেথুন-স্কুলে একটা চালাক চতুর মেয়েকে বিকালের দিকে প্রায়ই অন্যমনস্ক এবং ক্লান্ত দেখতে পেতাম। একদিন সে মূৰ্চ্ছিত হয়েও পড়ল। তাকে প্রশ্ন করে এবং তার সহ-পাঠিনীদের কথা শুনে আমি জান্‌তে পারলাম যে, গাড়ী এ'কে খুব সকাল সকাল আনতে যায় বলে, এর ভাগ্যে প্রায়ই পান্তা-ভাত বা আগের দিনের বাসী রুটী জোটে, তার উপর, মেয়েটা টিফিন খায় না। তাকে আমি বলাম—"তুমি যদি ফের এরকম কর, টিফিন না খাও, ত, তোমার পড়া আমি নেবো না, আর ক্লাশে তোমায় last থাক্‌তে হবে। এমনি কর্‌লে তুমি স্কুলেই পড়্‌তে পারবে না, আমি হেড-মাষ্টার মশাইকে বলে দোবো, তোমার নাম কাটিয়ে দিতে।" মেয়েটার বাড়ীর লোকে আমার উপর খুব রেগে গিয়ে, হেড-মাষ্টারের কাছে অভিযোগ এনেছিলেন—"আমার মেয়ে খেতে পেলে কি না পেলো, বাঁচল কি মর্‌ল, তাতে ওঁর কি মাথা-ব্যথা? উনি নিজের কাজ করুন্‌।" হেড-মাষ্টার মশাই বলেছিলেন—"ও ত নিজের কাজই করছে। এ রকম অনাহার ক্লিষ্ট, দুর্ব্বলাকে ও কি ক'রে পড়াবে?" পেটের খোরাকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, শুধু মনের খোরাক যোগাতে ব্যস্ত বলেই ত' দেশের তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের আজ এই চেহারা।

কোনও কোনও বাবা মা আছেন যারা মনে করেন, ক্লাশের সকল ছাত্র বা ছাত্রীই যখন সমান টাকা মাহিনা দিচ্ছে, তখন সকলেরই সব বিষয় সমান-রূপে জানা উচিত। ক্লাশের যেটা standard তার নীচে হলেই, শিক্ষককে শুধু যে জবাব দিহি দিতে হয়, তা নয়, ক'এর যদি খ'এর সমান ইংরাজীতে বা অঙ্কে ব্যুৎপত্তি না হয়, তারও কারণ জানাতে হয়। কারো কারো যে কোন বিষয়কে আয়ত্ত কর্‌বার বিশেষ একটা শক্তি থাকে, তা' তাঁরা বোঝেন না। আমি সঙ্গীত, সূচী-শিল্প আর চিত্র-বিদ্যার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের এ কথা অনেক বার বল্‌তে শুনেছি, অমুকের বাবা-মা আমাকে জ্বালাতন করে তুলেছেন; তিনি কিছুতেই বুঝবেন না যে, তাঁর কন্যার সুর-বোধ নাই, কিম্বা সেলাই এর প্রতি অনুরাগ নাই, কিম্বা সরল বা বাঁকা রেখার প্রভেদ

তত বোঝে না, কিম্বা বর্ণ-জ্ঞান নাই। অনেক চেষ্টা বা ঘসা-মাজার ফলে, এ বোধ-শক্তি বিকশিত হয়, কিন্তু সে, এই বিষয়ে স্বাভাবিক প্রতিভা-সম্পন্না ছাত্রীকে যে ধরিতে পারে না, তা' বাবা মা বুঝ্‌তে চান না। আমাকে একবার একজন মা জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার মেয়েটিকে আপনি কেমন মনে করেন। আমি বল্লাম—"বেশ চমৎকার, খুব চালাক চতুর মেয়েটী।" তিনি অমনি তার term reportটা বাহির করে বল্লেন "তবে?" মেয়েটা কোনও বিষয়েই শ্রেণীতে প্রথম-স্থান অধিকার করে নাই। সে ছিল ভারী চঞ্চল এবং সর্ব্বদাই অন্যের ভাবনা ভেবেই অস্থির। সেই শ্রেণীতে এই মেয়েটার মতই বুদ্ধিমতী এবং এর চেয়েও বুদ্ধিমতী দু তিনটা মেয়ে ছিল, যারা পরের চরখায় তেল দেওয়ার চেয়ে নিজের চরখায় তেল দেওয়াটাই বেশী ফল-দায়ক মনে করত, ফলে, তারাই প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি স্থান অধিকার করেছিল। আমি খুব ধীরভাবেই বল্লাম—"আপনার মেয়ে খুব চালাক, কিন্তু তার চেয়েও চালাক মেয়ে যে শ্রেণীতে নেই, একথা ত আমি বলি নি।" জননী দেবী চোখের জল ফেলতে ফেল্‌তে বল্লেন—"আপনি একটু খোঁজ করে দেখ্‌বেন, ক্লাশের শিক্ষয়িত্রী বিদ্বেষ করে আমার মেয়েটাকে কম নম্বর দিয়েছেন কি না"। আমি বল্লাম—"একজনের না হয় বিদ্বেষ থাকতে পারে, সব শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বিদ্বেষ থাকার কারণ কি? আপনার মেয়েটী এতই দুষ্ট, আর শাসনের বাহিরে মনে করার মত ত আমি কিছু দেখি না। ও শুধু একটু অন্যমনস্ক আর চঞ্চল—এ ছাড়া কিছু নয়।" মা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লেন—"আপনি ত শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে কিছু শুন্‌বেন্ না—আমি আর কি কর্ব্ব?" আমি বলিলাম—"আমি যে তাঁদের সঙ্গে কাজ কর্‌ছি, আমি যে তাঁদের জানি।"

আর এক বার একটা মেয়ে গানের প্রাইজ পাওয়ার পর, তার জ্যাঠামশাই আমাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন—"আমার স্ত্রী বলছিলেন, আমাদের মেয়েটাও,—র মতই চমৎকার গান গায়, তবে সে প্রাইজ পেলো না কেন?" আমাদের একজন একটু বিরক্তির সুরে বলে উঠ্‌লেন—"আপনার স্ত্রী পরীক্ষা করেন নি বলে, আর কিছুর জন্যে নয়।" পিতাটী একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলেন—"না, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, ওকে ততটা যত্ন নিয়ে শেখানো হয় নি। শেখানোর দিক থেকে গলদ্ থাকতে পারে ত?" আমি বল্লাম—"আবার শেখার দিক থেকেও গলদ্ থাকে কি না! অবশ্য যিনি শেখাচ্ছেন তাঁর খুবই অন্যায়, আপনার মেয়েও যে টাকা দিচ্ছেন, আপনার ভাই-ঝিও তাই দিচ্ছেন। শিক্ষকের উচিত ছিল, ওজন করে, সমান মাপের, সঙ্গীত-বিদ্যা দুজনাকে বাঁটিয়া দেওয়া। ভবিষ্যতে যাতে এরকম হয়, আমরা তা' দেখে দিব, আপনিও আপনার মেয়েটাকে বল্‌বেন, তিনি যেন যত্ন করে গ্রহণ করেন অন্যমনস্ক হয়ে বা অন্য কোনও কারণে, কম না নেন।" জানি না, তিনি আমার কথা বুঝলেন কি না। ছোট একটা "হুঁ"বলে, আমাদের নমস্কার জানিয়ে, তিনি চলে গেলেন।

বাস্তবিকই, অনেক বাবা মা মনে করেন আমরা শিক্ষকেরা যেন দোকান-দারী কর্‌ছি। দুই টাকা দামে, সকলকেই সমান ওজনে, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, ইত্যাদি মেপে তুলে দিব। তা'ত দেওয়া হ'ল ক্লাশে—কিন্তু পাত্রের গভীরতা, প্রসারতা, ইত্যাদি অনুসারে সে গুলি যে ধারণ করা হ'ল, তাহা তাঁদের খেয়ালে আসে না।

অনেক বাবা মা আবার আব্দার ধরে বসেন, তাঁদের ছেলে মেয়ের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি

রাখ্‌তে, তাদের বেলায় নিয়মগুলি ঢিলা করতে। আমার একটী বন্ধুকে একজন, তাঁর ছেলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে অনুরোধ করায়, বন্ধুটী বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছেলের মা বাবাকে কি বলেছিলেন জানি না, কিন্তু, আমায় এসে অনেক কথাই বলেছিলেন. তা'র একমাত্র কারণ, আমি এঁদের দুজনার সঙ্গে একটু পরিচিত ছিলাম। জালন্ধরে কন্যা-মহা-বিদ্যালয়ে নিয়ম আছে যে, ভোর পাঁচটায় উঠে, ছাত্রীরা আপন আপন শয্যা আপনি পরিষ্কার করে', আপন আপন কাজে যায়। একজন বড়লোকের গৃহিণী এসে একদিন আমাদের কাছে কান্না সুরু করে দিলেন—"আমার মেয়েরা বাড়ীতে আটটার আগে ওঠে না চাকর তাদের খাবার বিছানার কাছে এনে দেয়, তবে তারা খায়।" আমি বল্লাম "তা' বেশ। তা' আমাদের কি কর্‌তে বলেন? এখানে ত চাকর নেই, কাজেই সে কিছু খাবার নিয়ে বিছানার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। তারপর, বিদ্যালয়ের নিয়ম যে, পাচটায় সময় শয্যাত্যাগ করা।"

"হাঁ, তা'ত, কিন্তু তা'তে আমার মেয়েদের যে কষ্ট হয়।"

"হবারই ত কথা। তা আপনি তাদের এমন কোনও স্কুলে দিন না কেন, যেখানে আটটা পর্য্যন্ত তারা বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে তারপর চাকরে খাবার এনে দিলে, উঠে খাবে।"

সঙ্গিনী কুমারী লজ্জাবতী হেসে বলেন—"তা কেন? বাড়ী নিয়েই যান না ওদের। এখানে থাক্‌লে ত ঐ নিয়ম মান্‌তে হবে। মা বা' বলেন তাতে বুঝ্‌লাম যে, বাড়ী নিয়ে যাওয়া বা অন্য স্কুলে দেওয়া হতে পারে না, কারণ, তাঁর কন্যাদের বিবাহ-সম্বন্ধ যেখানে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাঁরা চান, কন্যারা এই বিদ্যালয়েই পড়ে। কাজেই, আমাদের উচিত হয়, নিয়ম শিথিল করা। কিন্তু, কাজটা করতে বলা তাঁর পক্ষে যতটা সহজ, করাটা আমাদের পক্ষে ততখানি যে নয়, তা বুঝতে তাঁর প্রায় তিন দিন লেগেছিল।

আর একবার, রাত্রি দশটার সময়, লজ্জাবতী দেবী আমায় ডেকে আন্‌লেন, বাহিরের কন্‌কনে শীতের মধ্যে, একজন পাঞ্জাবী বাবুকে বোঝাবার জন্য যে, নিয়মভঙ্গ করা, প্রিন্সিপ্যালের পক্ষেও অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বাবুটি বুঝ্‌লেন না। তিনি লজ্জাবতীকে সম্বোধন করে বল্লেন—'কুমারীজী, আপনার প্রতি আমার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল. কিন্তু, আমি আজ তা' হারালাম।" আমি আসার প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে, এই মেয়েটি এঁকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিলেন। কনকনে শীতে, লেপ থেকে বাইরে এসে, আমার মেজাজ্‌টা কিন্তু বড় ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। আমি তাই উত্তর করলাম - 'আপনারই ত ক্ষতি হ'ল, কারণ, হারালেন যে আপনি।'

শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনের সময় দেখা যায়, অনেক বাবা মা পুত্রকন্যার রুচি ও ঝোঁককে একেবারে অগ্রাহ্য করে, নিজেদের মত চালিয়ে যান্। আবার অনেক সময় দেখা যায়, পুত্র বা কন্যা, আপনার ইচ্ছামত শিক্ষণীয় বিষয় পছন্দ করে নেয়, তারপর বাবা মা হয়ত এমন একটা পেশা তাকে অবলম্বন কর্‌তে বলেন, যার সঙ্গে তার শিক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতার কোন মিল থাকে না। বি-এ-তে দর্শন আর ইতিহাস নিয়েছে যে, তাকে আমি ডাক্তারী পড়্‌তে যেতে দেখেছি; কারণ, বাবা কি মা চান্। আই-এ-তে লজিক, ইতিহাস আর অঙ্ক নিয়েও ডাক্তারী পড়তে যায়, এমন ছেলেও দেখেছি।

এইসব বিষয়ে আমি বরাবরই ব্যক্তি-তন্ত্রতা ও বিশিষ্টতার পক্ষপাতী। এই জন্যই বোধ করি, আজ পর্য্যন্ত খুসী মনে নারী সমাজকে ডাক দিয়ে এই কথাটি বল্‌তে পারলুম না যে, আপনারা খালি চরখা কাটুন, আর হিন্দী শিখুন, আর কিছু শিখে দরকার নাই। ভয় হয় পাছে, এতে কারো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের হানি হয়ে যায়।

আমার একটা ছাত্রীর ইতিহাস পড়ার দিকে খুব ঝোঁক্ ছিল। ইতিহাস সে খুবই ভালবাসিত। তাই তার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, সে ইতিহাস এবং লজিক নেয়, কারণ, লজিক না নিলে, সে মনস্তত্ত্ব বা সমাজ-তত্ত্ব পড়িবার পথ খোলা রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কিন্তু তার বাবা চাইলেন যে, সে লজিক এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান নেয়। তার আন্তরিক ইচ্ছা দেখে, আমি তার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লুম যে, তাকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বদলে, ইতিহাস নিতে দেওয়াই ভাল। বাবা আমাকে বল্লেন যে, তিনি কন্যাকে সুগৃহিণী গড়ে তুল্‌তে চান বলেই বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন। বিদুষী পণ্ডিতা কর্ব্বার জন্য নয়। কাজেই, তাকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান নিতেই হবে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"আই-এতে, উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিলে কি খুব সুগৃহিণী হওয়া যায়? কেন?" তিনি উত্তরে বল্লেন "উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান পড়্‌লেই মেয়ে ভাল রান্না কর্‌তে পার্‌বে।" রান্নাটা যে একটা আলাদা বিজ্ঞান এবং আর্ট, তা বাবা-টার জানা ছিল না। আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম—"তরকারী কুট্‌তেও আপনার মেয়েটা ভাল করেই পার্‌বেন। চিড়া জীরা, লাউ-ঘণ্টের লাউ, ইত্যাদি কোটা তার পক্ষে খুব সহজ হবে।" বাবা খুসী হয়েই বল্লেন—'হাঁ, তাও ত ঠিক। তরকারী কোটাও ত শিখ্‌তে হয়—সেটাও ত দরকারী।" মেয়েটিকে এই রকমে সুগৃহিণী হওয়াই শিখ্‌তে হ'ল। তার আর ইতিহাস শেখার সাধ মিটিল না।

আমার একটা ছাত্রের জীবনেও বাবার ইচ্ছা জয়যুক্ত হতে গিয়ে, খুব বড় রকমের একটা করুণ-রস সৃষ্টি করে তুলেছিল। এ ছেলেটা বড় ভাবপ্রবণ এবং শিশু বয়সেই চিত্রাঙ্কনে খুব দক্ষতা দেখিয়েছে। এর বড়ই ইচ্ছা, চিত্রকর হয়। আমার ইচ্ছাধীনে যতদিন ছিল, ততদিন এর স্বাভাবিক-শক্তির স্ফুরণে আমি যতটা সুবিধা এবং সহায়তা করিতে পারি, ত্রুটী করি নাই। আমার ছাত্রত্ব শেষ করে সে যখন গেল, তখন তাহার বাবাকে এই দিকে একে শিক্ষা দিতে বারম্বার করে অনুরোধ করে ছিলাম। কিন্তু তিনি বল্লেন—"আমাদের বংশে কেউ কোন কালে চিত্রকর হয় নি, বংশের পুরুষেরা ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেছে। আমার বাপ, দাদা, উকীল ছিলেন, আমি উকীল, আমার ভাই উকীল,—আমার ছেলেও উকীল হবে।" এর উপর কি আর অন্য কোন যুক্তি খাটে? এ হিসাবে ত কালিদাসের ছেলে, নাতি সকলকারই "রঘুবংশ" লেখা উচিত ছিল, কিম্বা সেক্ষপীয়রের বই লেখাটা একবারেই ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বোঝে কে?

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

তরণীসেন।

"ঘরের শত্রু বিভীষণ" এই প্রবাদ-বাক্য, ত্রেতা-যুগের লঙ্কাধিপতি দশাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। কেহ স্বজাতি বা স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই 'বিভীষণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিভীষণ ধর্ম্ম ভীরু ছিলেন। লঙ্কেশ্বরের অবৈধ কার্য্য তিনি কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। নীতি-ধর্ম্মের অনুগত হইয়া জীবনাতিপাত করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যখন রাবণ, রামের পত্নী সীতাদেবীকে অন্যায় রূপে হরণ করিয়া আনেন্ এবং তদুপলক্ষে রাম রাবণে যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন বিভীষণ, সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করিয়া, শান্তি স্থাপন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। তাহাতে কোন ফল হয় না। বরং, বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া মনোদুঃখে, ন্যায়ের আদর্শ, রামের শরণাপন্ন হন। উভয়পক্ষে যুদ্ধের নিবৃত্তি না হওয়ায়, বিভীষণকে পাইয়া, রামচন্দ্রের মন্ত্রণা কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়। সসম্মানে, বিভীষণ রামের মন্ত্রণা পরিষদে স্থানলাভ করেন। মন্ত্রণা ব্যপদেশে বিভীষণ স্বজাতি ও স্বদেশের প্রভূত অপকার সংসাধিত করেন। পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এককথায় বলিতে হয়, বিভীষণের সহায়তায়ই রামচন্দ্র বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেন। প্রিয়তমা সীতার উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হন। ন্যায় পক্ষপাতী হইলেও, বিভীষণ আত্মীয়-দ্রোহী হওয়ায়, জগতে নির্ম্মল-গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি স্বদেশের পতনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া পাপ ভাগী হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন যেন আত্ম-দ্রোহিতা কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বীর তরণীসেন সেই বিভীষণের তনয়। পিতা দেশের শত্রু-পক্ষে যোগদান করিলেও, তরণীসেন দেশের পক্ষে থাকিয়া, দেশাধিপতি, জনকের অপমানকারী, জ্যেষ্ঠ তাত দশাননের গৌরব-রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে দ্বিধা-শূন্য ছিলেন। পিতার দৌর্ব্বল্যের অনুসরণ করা, তাঁহার কখনও অভিপ্রেত হয় নাই। দেশাত্মবোধ, তাঁহাকে পিতৃ-বৈরী লঙ্কেশের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। বিভীষণের বীর পুত্র তরণীসেন, তাই রাবণের সেনাপতি হইয়া, রামের সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অলোক-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, দেহপাত করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

তরণী, জগতে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ'-স্বরূপ-হইলেও, স্বদেশ-দ্রোহী পিতার পন্থাবলম্বন করা ধর্ম্ম-সম্মত নহে। স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব-রক্ষা করা মানব-মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যের প্রতিকূল জনকের পদাঙ্কানুসরণ না করিলে, কোনই প্রত্যবায় হয় না বরং, মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়।

তরণীসেন আরো শিক্ষা দিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে, ব্যক্তিগত মান-অপমান গণনা সঙ্গত নয়। উহা ভুলিয়া গিয়া, জাতীয়-স্বার্থকে বড় করিয়া ধরিতে হয়; তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। তাহাতেই জীবনের সার্থকতা।

তরণী যদি পিতার অপমানকে বড় করিয়া তুলিতেন, দেশের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন,

তবে তিনি সেনাপতি-রূপে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে পারিতেন না। পিতার ন্যায় স্বদেশ-দ্রোহী, আত্মীয়-দ্রোহী সাজিতেন। রামের পক্ষাবলম্বন করিয়া পিতার যোগ্যপুত্র হইতেন। কিন্তু, তাহার অত্যুচ্চ চরিত্র, তাঁহাকে অবনত হইতে দেয় নাই। স্বদেশ ও স্বজাতিকে [illegible] মত নীচতা লাভ করিতে পারেন নাই। তরণীর চরিত্র কি অপূর্ব্ব। স্বদেশ-প্রেম কি প্রগাঢ়!! স্বজাতির গৌরব-রক্ষায় আগ্রহ কি অসামান্য।

ত্রেতার রক্ষ-পরিবারের বীর-তরণীর আদর্শ, বর্ত্তমান মানব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে অনু করনীয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রেই হউক, সমাজেই হউক, বিশিষ্টগণের সংখ্যাধিক্য, শক্তির কথা, কলঙ্কের কথা। তরণীর সংখ্যা-বর্দ্ধনই কল্যাণের কারণ, গৌরবের বিষয়, সাফল্যের নিদান। ব্যক্তিগত লাভ লোকসান, মান অপমান ভুলিয়া গিয়া, সমষ্টির ক্ষতি-বৃদ্ধির গৌরব অগৌরবের গণনা করিয়া কার্য্য করিতে না শিখিলে, কখনও দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল হয় না। কর্ম্মীও ধন্য হইতে পারেন না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা।

নগর ও পল্লী-গ্রাম।

প্রতীচ্য-জগতের সংস্পর্শে এ দেশের পল্লী-নিবাস বিধ্বস্ত হইতেছে। নানা কারণে, লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নগর পুষ্ট হইতেছে, নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পল্লীগ্রাম হতশ্রী হইয়া, ক্রমে কেবল কৃষিজীবির বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষা বা বিষয়-কার্য্য অনেককে নাগরিক হইতে বাধ্য করে। আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণ পল্লীগ্রাম যোগাইতে পারে না। বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ব্বে, পল্লী-গ্রামস্থ টোল, পাঠশালা বা মুক্তাবে চলিত। এক্ষণে নাগরিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন সময়-ক্ষেপ না করিলে, কাহারও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার দাবি জন্মে না। বিচার, পূর্ব্বে, গ্রাম্য-জমিদারী কাছারিতেই হইত, এক্ষণে, তাহার অন্বেষণ করিতে হয়, নগরে। চাকরী- ও আইন-ব্যবসায়ী বাঙ্গালীর জীবিকা-স্থল, নগর। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, নগরে। বিলাতী শিল্পজাত-দ্রব্য ভিন্ন, আবশ্যক ও অনাবশ্যক, অনেক কার্য্য চলে না, তাহার আশ্রয়-স্থল, নগর। সামান্য প্রয়োজনে, লোককে নগরের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষিত ও মার্জ্জিত লোকের সংসর্গ, নগর ব্যতীত ঘটে না। রোগা-ক্রান্ত ব্যক্তির আশার ক্ষেত্র, নগর। নানা স্থানে গমনা-গমনের সুবিধা, নগর হইতে। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার পল্লীগ্রামে যতদূর সম্ভব, নগরে তেমন নহে। অনেক প্রকার সুখ, সুবিধা ও বিলাসিতা গ্রামে সম্ভব হইয়া উঠে না।

অথচ, পল্লী-সমষ্টি, পল্লী-প্রতিষ্ঠান লইয়াই বাঙ্গালা-দেশ চিরকাল আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার অতীত-সমৃদ্ধি, অতীত-গৌরব, পল্লীতে। বঙ্গের অধিকাংশ আধুনিক নগর, বর্দ্ধিত-কায় পল্লী মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষা এই যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, ইহাতে সুফল কি কুফল ঘটিতেছে, এবং কোন কুফল ঘটিয়া থাকিলে, তাহার কি প্রতিবিধান কর্ত্তব্য, একবার ভাবিয়া দেখা

উচিত। এই নগরে আসক্তি, দেশে ঘোর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। পল্লী-সমাজের সে দৃঢ়তা আর নাই। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শিথিলতা হয়ত আধুনিক শিক্ষার ফল। কিন্তু, আচার ব্যবহারের শিথিলতা, অনেক পরিমাণে, প্রাচীন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বাসেরই ফল। ইহাতে যে কিছু সুফল না হইতেছে, এমন বলা যায় না। বিভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সংমিশ্রণে, উচ্চতর শ্রেণীতে, উদারতার বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্ততঃ পাওয়া উচিত বটে। হয়ত সঙ্গে সঙ্গে একতার বীজও কতকটা অঙ্কুরিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহাও বলা যায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক কুপ্রথার প্রতিবিধান, সমবেত ভাবে কার্য্য, ইত্যাদি নগরে যতদূর সম্ভব, সঙ্কীর্ণ পল্লী-সমাজে ততদূর নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, দেশ, এখনও, প্রধানতঃ কৃষিজীবি। যে দেশের সামাজিক-ভিত্তি পল্লী-জীবনে, সে দেশের শিক্ষিত লোক বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করায়, পল্লী-সমাজের অবস্থা কি ঘটিতেছে দেশের ও তাহার অধিকাংশ লোকের অবস্থা কি দাড়াইতেছে। আর, যাহারা নগরে জীবন-যাপন করিতেছেন, তাঁহাদেরই বা চতুর্ব্বর্গ-লাভের আশা কতদূর?

অবস্থার তাড়নায় অনেককে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা-বাসী হইতে হইয়াছে। উদরান্নের সংস্থান সম্বন্ধে, ম্যালেরিয়া হইতে জীবন-রক্ষাও কম প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহাদের অবস্থা খুব ভাল নহে, তাহারা যে কলিকাতায় খুব সুখ সচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? বাস-গৃহ ও দুগ্ধাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের যে অবনতি হইতেছে, ইহাই অনেকের মত। অল্পায়তন গৃহে, এক বাড়ীতে বহু পরিবারের সমাবেশ, নানা কারণেই বাঞ্ছনীয় নহে। বদ্ধ-বায়ু প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল অবস্থানে, স্ত্রী-জাতির স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও অকাল মৃত্যু অত্যন্ত অধিক। আর দুগ্ধের অভাবে শিশুদের যে অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা সকলেরই বোধ-গম্য। থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখার সুবিধা আছে, সত্য। কিন্তু কলিকাতায় যে অবস্থায় সাধারণ ভদ্র-লোকগণকে অবস্থান করিতে হয়, তাহা যে পল্লী-গ্রাম অপেক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না। জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলোক-যুক্ত কলিকাতার সহিত, নিম্নে, সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, দুইটী মফঃস্বল জেলার ও সমগ্র বাঙ্গালার পল্লী-গ্রামের মৃত্যুর হার তুলনা করা যাইতেছে—

	১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু (হাজার করা)	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়	১৯১৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যু (হাজার করা)	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়
কলিকাতা—	৩৫	২৬ ৯	৪২ ২	২৮·১
২৪ পরগণা— (মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	২৮ ৪	২৪ ৮	৩৯ ৪	২৫ ৪
ফরিদপুর জেলা (মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	৩২ ৬	২৯ ৫	২৯	২৯·৮
সমগ্র বাঙ্গালা (মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	—	—	৩৬ ৪	৩১·৭
সমস্ত মিউনিসিপালিটী	—	—	৩৬·২	৩১·২

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার অনেক স্থানে, এবং বিশেষভাবে উল্লিখিত দুইটা জেলায় [illegible], যথেষ্ট ম্যালেরিয়া বর্ত্তমান। পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের সহিত তুলনায়, ১৯১৮ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মৃত্যুর আধিক্য, হয়ত প্রধানতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা-জনিত। কিন্তু, যে-দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন সত্বেও, কলিকাতা, ম্যালেরিয়া ও জল-কষ্ট পীড়িত পল্লী-গ্রামের নিকট, স্বাস্থ্য-রক্ষার হিসাবে বিজয়-মাল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। আবার, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ, মানিকতলা ও বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীতে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাই। এখানে কলিকাতার অসুবিধা প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান, কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক-প্রণালী সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। মফঃস্বলস্থ নগরগুলির অবস্থা বরং কতকটা ভাল। সাধারণ-লোকে মুক্ত-বায়ুর অভাব অনুভব করে না, মিউনিসিপ্যালিটীর উপকারিতাও কতকটা পায়; খাদ্য-দ্রব্যের সুবিধা ও অসুবিধা পল্লীগ্রাম ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী।

পূর্ব্ববঙ্গের দুইটা গ্রাম ও নগরের হাজার করা মৃত্যুর হার নিম্নে দেওয়া হইতেছে—

	১৯১৮ খৃষ্টাব্দে	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়	১৯১৯ খৃষ্টাব্দে	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়
ফরিদপুর গ্রাম	৩২.৬	২৯.৫	২৯	২২.৮
ফরিদপুর নগর	[illegible]	২২.১	১৮.২	[illegible]
মাদারিপুর	২১.৫	২২.৮	[illegible]	২৪
ঢাকা গ্রাম	[illegible]	২১.৫	[illegible]	[illegible]
ঢাকা নগর	৩১	[illegible]	৩১	[illegible]
নারায়ণগঞ্জ	—	—	[illegible]	[illegible]

একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে পল্লী-গ্রামে স্বাস্থ্য-রক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বিত হইলে, মৃত্যুর হার বিশেষ পরিমানে কমিয়া যাইবে এবং নগরের সহিত তুলনায় পল্লীগ্রাম অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইবে। পল্লীগ্রামের একটা প্রধান অভাব, বিশুদ্ধ পানীয় জল। এই অভাবের কারন কেবল অর্থাভাব নহে, গ্রামবাসীর অভ্যাস-দোষ ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, ফরিদপুরে বিশুদ্ধ পানীয়-জলের ব্যবস্থা হওয়ার পর, সেখানে মৃত্যুর হার পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয় নাই, পল্লীগ্রামে তাহা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে বিশুদ্ধ জলের সংস্থান থাকিলেই, অনেক উপকার হইতে পারে। এখনও ফরিদপুরের ন্যায় জেলার পল্লীগ্রামে, যে স্থান স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, সেখানে ১১৩ বৎসর বয়সে পুত্রোৎপত্তি ও অধিকতর বয়সে মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। * স্থানীয় জল বায়ুর উন্নতি ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা হইলে, সেরূপ স্থানের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্বাস্থ্যের হিসাবে, আর্থিক হিসাবে, অধিবাসীর হিসাবে, কোন দিকেই আর পল্লীগ্রামের

* Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpore District, p. 96

সাবেক দিন নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে, সভ্যতার অঙ্গ (লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি) যোগাইতে গিয়া, কৃষিকার্য্যের পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, পল্লীগ্রামের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-উন্নতির উপায় অবলম্বিত না হওয়ায়, অনেক পল্লী এক্ষণে ব্যাধি ও মারীভয়ের আকর। পল্লীগ্রাম যাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিত, এই উন্নতি-সাধনে এক্ষণে আর তাহাদের সহায়তা পায় না। লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোকের প্রয়োজন ও বিলাসিতা বাড়িয়াছে কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। এখন আর ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে ভদ্রলোকের উদরান্নের সংস্থান হয় না। পুষ্করিণীজাত মৎস্য (বোধ হয়, ভূমি অধিকতর উন্নত হওয়ায়) ফরিদপুরের ন্যায় মৎস্যপূর্ণ জেলায়ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আর সঙ্কুলান হয় না; বিলাসিতার আমদানি বাড়িয়াছে, বিলাসিতা উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। তাহার পরিতৃপ্তির কি উপায় কোথায়? জমির খাজনাতে সাধারণ ভূমাধিকারীর আর কয় দিন চলে? মুদ্রার মূল্য কমিয়াছে, প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রম, যাহা পূর্ব্বে 'ভদ্র' আখ্যাধারী ব্যক্তিগণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এখন অপমান-জনক বিবেচিত হইতেছে। নানা প্রকার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়, অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কিন্তু তাহার স্থান অন্যরূপে পরিপূরিত হইতেছে না। ভদ্রগণ চাকরী ও ওকালতী শিখিয়া বসিয়াছেন। উভয়ত্রই, ন স্থানং তিল-ধারণে।

ইংরাজী সভ্যতার রশ্মি দৃষ্টিপথে আসিয়াছে, কিন্তু সেই রশ্মিতে পথ দেখিবার শক্তি এখনও জন্মে নাই। এই শক্তি জাগরূক করিতে হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাস শ্লথ হইয়াছে; কিন্তু অনেক স্থানেই, ধর্ম্মের ভাণ মাত্র আছে। সামাজিক কু-নিয়ম দলিত হইতেছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন করিবার তেজ নাই। অভাবে ও কু-শিক্ষার ফলে, গ্রাম্য সরলতা এক্ষণে উপন্যাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা সাক্ষ্যে পল্লীগ্রামের মস্তিষ্ক আলোড়িত। এই মস্তিষ্ক সুপথে চালিত করিবার ভার কে নেয়? গ্রামবাসী যাহাতে দলাদলি ও পরস্পরের সহিত কলহ ও মোকদ্দমায় সময়পাত না করিয়া, দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা কে করে?

শিক্ষিত-সমাজ পৃথকভাবে নগরে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিলে, তাহা হইতে পারে না। কুসংস্কার দূর করিতে, সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে, শিক্ষিত-সমাজের সহায়তা আবশ্যক। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের এখনও নৈতিক-বল কম, কার্য্য-ক্ষমতা খুব অধিক নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে, সৎভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকিলে, এই সকল অভাব শীঘ্রই পলায়ন করিবে। স্বাস্থ্য-উন্নতি ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টার উদ্বোধন আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই অবস্থানুযায়ী সাহায্য করিবেন।

শিক্ষিত-সমাজকে বুঝিতে হইবে, গ্রাম অশ্রদ্ধেয় নহে। গ্রামেও অনেক প্রকার সুখ ও শান্তি আনয়ন করা চলে। গ্রামের ও আকৃতি ও প্রকৃতি সভ্যতার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া, জন-সমাজে উপস্থিত করা চলে। যাঁহারা এক্ষণে নাগরিক, তাঁহাদের কতকাংশের

গ্রামবাসী হওয়া আবশ্যক। গ্রামে থাকিয়াই, তাঁহাদিগকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে, অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে হইবে। এই অর্থ, দেশ দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি? কিঞ্চিৎ ভাবা-শিক্ষা ও নগরে চাকরীর চেষ্টা দ্বারা অবশ্যই জন-সাধারণের আর্থিক অভাব দূর হইতে পারে না। পল্লীগ্রাম পূর্ব্বে যে ভাবে চলিত এখন সে ভাবে চলিলেও, এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। বাঙ্গালার একটা জেলা ধরা যাউক্। ফরিদপুরের ভূত-পূর্ব্ব সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার, জ্যাক সাহেব, অনুমান করেন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, এই জেলার লোক-সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ ছিল। ১৯.. সালের আদম সুমারি অনুসারে, উহা একুশ লক্ষের উপর। গত লোক-গননায়, উহা বাইশ লক্ষের উপর বলিয়া জানা গিয়াছে। যে ভূমির উপসত্ত্বের উপর নয় লক্ষ লোক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাতে বাইশ লক্ষ লোকের বাঁচিতে হইলে, এবং তাহার উপর, অধিকতর বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, অবশ্য নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্বীকার করি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জমি চাষ হয়। কিন্তু লোক-সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, কর্ষিত-ভূমির পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়িয়াছে কিনা, সন্দেহ। বাড়িয়া থাকিলেও, জলাভূমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায়, মৎস্যের পরিমাণ কমিয়াছে। পতিত-ভূমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায়, গবাদি পশুর খাদ্য কমিয়াছে। ফরিদপুরে প্রতিবর্গ মাইলে জন-সংখ্যার গড়, ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী, অথচ, ফরিদপুরের শতকরা সাতাত্তর জন অধিবাসী কৃষিজীবী। শিল্প, নাই বলিলেই হয়, যাহা ছিল, প্রতিযোগিতায় উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। বিলাতে, ‚ অংশ লোক মাত্র কৃষিজীবী, ৺ অংশ লোক, বড় বড় নগরে বাস করে।

কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিলাসিতা এখনও কম মাত্রায় প্রবেশ করায়, কৃষি-জীবী লোক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রভৃতি দুর্ঘটনা না হইলে, গ্রামে খাওয়া পরা এখনও এককপ চালাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগকে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, অথচ যাহাদের আয় কম, দিন দিন শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদেরই জীবন-ধারণ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর ও অর্থশালী লোকের মধ্যেই, নগর-বাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং এই শ্রেণীর মধ্যেই আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক অধিক। দেশের মধ্যে, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নত-কৃষি-প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন, ইহাদিগের, ও তৎসঙ্গে গ্রামবাসী কৃষি-জীবি লোকের, সুখ-সাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির উপায় নাই।

বিলাতের সহিত এদেশের তুলনা হয় না। বিলাত, প্রধানতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর-শীল, বিলাতের কৃষি কার্য্যও ভিন্ন উপায়ে—প্রধাণতঃ, ধনবান ব্যক্তির ব্যয়ে শ্রমজীবী লোক দ্বারা—পরিচালিত। বিলাতি নিয়মে শিল্প ও কৃষি উভয়ই, বিস্তর মূল-ধন সাপেক্ষ। বিলাতি শ্রমজীবি-সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রবল, অভাবে উত্তেজিত, তাহারা এক্ষণে নানারূপ দাবি উপস্থিত করিতেছে। এখানেও, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠস্থ শ্রমজীবি-সম্প্রদায়, তাহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের অবস্থা ও অভাব গ্রাম্য-শ্রমজীবির অভাব ও অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের কৃষকের, জমীর

উপর বিলক্ষণ স্বত্ব আছে। তাহারা আড়ম্বর-শূন্য জীবনেও, মোটের উপর, বিলাতী শ্রমজীবি অপেক্ষা সুখী। বিলাতের কৃষি-প্রণালী এদেশের অধিকাংশ স্থলেই চলিবে না। আমাদের কৃষকের স্বাতন্ত্র্য ও শান্তি বজায় রাখিয়াই, গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যে ইহাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় না। সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। পরিবারের কতকলোক অবশ্যই, উপদেশ, শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে, ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। শিক্ষিত ভদ্রলোক গ্রামবাসী হইলে উভয়ের সমবেত চেষ্টায় কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য, পশু পালন, ইত্যাদির উন্নতি বিধান হইতে পারে।

সময়ের গতি ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির সহিত, কতক লোকের নগরে বাস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে কেবল নগর বাসের জন্য নগর-বাস, বাঞ্ছনীয় নহে। এ দেশের জন-সংখ্যা, শ্রেণী-বিভাগ ও পুরাতন সামাজিক-ব্যবস্থা এরূপ, যে, চেষ্টা করিলে গ্রামগুলিকে আবার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব নহে। চাই, প্রবৃত্তি ও শক্তি-প্রয়োগ, চাই, উপযুক্ত পরিমাণে চেষ্টা। গ্রামে কিরূপ উন্নতির সোপান নির্ম্মিত হইতে পারে, খৃষ্টান মিশনরিগণ দ্বারা পরিচালিত, ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি স্কুল, তাহার প্রমাণ। খুব বৃহদায়তনে না হউক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনে, দেশের সুখ সমৃদ্ধি-বর্দ্ধক অনেক কারখানা, কারবার ও সমিতি, নগরের বাহিরেও পরিচালিত হইতে পারে। এ দেশে যেমন শিক্ষা ও অভাব প্রসার-লাভ করিতেছে নগরে বাস যেমন ব্যয়-সাধ্য ও অনেক সময়ে স্বাস্থ্যের বিরোধী হইয়া দাড়াইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের এই দিকে মনোনিবেশ একান্ত কর্ত্তব্য। মফঃস্বলস্থ অধিকাংশ নগরে যেরূপ স্বাস্থ্য-বিভাগের ব্যবস্থা, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই, বহুৎ গণ্ডগ্রামে অথবা গ্রাম-সমষ্টিতে, তদনুরূপ কিছু করা চলিতে পারে। কেরাণী শ্রেণীর লোকে দেশ পূর্ণ করার পরিণাম কখনও, আর্থিক হিসাবে, মঙ্গল-জনক হইতে পারে না। যে শিক্ষায় জীবিকার্জ্জন ও নীতি-জ্ঞান জন্মে, দেশের অনেক স্থানেই তাহার ব্যবস্থা চলিতে পারে। অবশ্য, উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষার জন্য, কতক লোককে দূরবর্ত্তী স্থানে আসিতেই হইবে। বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিতে পারিলে, বা বড় বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে, বড় বড় নগরের সহিত সংশ্রব রাখিতেই হইবে। কিন্তু, যে সকল যুবক প্রতিবৎসর প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হইয়া সংসারে নিঃসম্বল অবস্থায় ঝাঁপ দিতেছে, তাহাদের জীবনে শান্তি ও সাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিতে হইলে, কেবল নগরের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল চাকুরী, ওকালতী, বা ইউরোপের আদর্শে পরিচালিত কারবারের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কেরানী ও উকীল দুনিয়াতে আবশ্যক, কিন্তু, তাহা ছাড়াও অনেক শ্রেণীর জীব আবশ্যক। মান্ধাতা মহারাজের সময়কার আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেও চলিবে না। স্থান, সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নূতন নূতন ব্যবস্থা, করিতে হইবে। ইউরোপের সামাজিক ইতিহাস ও আদর্শ আমাদের ইতিহাস ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র, একথা মনে রাখিতে হইবে। পল্লী-জীবন আমাদের সমাজের মজ্জাগত, পারিবারিক-জীবন ও কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য আমাদের বৈষয়িক-ব্যবস্থার ভিত্তি। আমরা ইউরোপের শ্রমজীবি-সমস্যার মধ্যে পড়িতে চাহি না। সমাজে

ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, সমবায়ের উপর কর্ম্মভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলে, আমরা দেশের ও জগতের উপকার করিতে পারিব। কিন্তু সাবধান, অসঙ্গত মর্য্যাদা-জ্ঞান যেন আমাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। আমরা যেন মনে রাখি, আমাদের আদর্শ রাজার যে তিনজন আদর্শ মিত্র, তাহার একটি চণ্ডাল, একটি রাক্ষস, ও একটা বানর। ব্যক্তিগত গুণ বা অবস্থাগত-পার্থক্য জগতে চিরকালই থাকিবে। আমরা যেন কৃত্রিম বা কল্পিত পার্থক্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরের সহিত বৃথা কলহে লিপ্ত থাকিয়া, দেশের ও সমাজের স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতার মন্দিরে বলি দেই না। জন-সাধারণের শিক্ষা ও সমবেত-ভাবে কার্য্য করার সঙ্গে সঙ্গে, কালের গতিতে সামাজিক পরিবর্ত্তন, অনিবার্য্য। শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইলে, প্রতিযোগিতা ও বহিঃস্থ লোকের সংস্রব, অবশ্যম্ভাবী। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষার উন্নতির সহিত এই সব প্রস্তাব জড়িত। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত, এই জনপূর্ণ দেশে, লোকেরও অভাব নাই। চাই, উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য-ব্যক্তির চেষ্টা। নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, চাকুরী-সংগ্রহে যে পরিশ্রম ও ক্লেশ হয়, সেই পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়া, গ্রাম্য কৃষি ও শ্রমজীবির সহিত একযোগে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কি উদরান্নের সংস্থান, এবং সঙ্গে সঙ্গে, দেশের উন্নতি-সাধন করা যায় না? খাদ্য দ্রব্যাদির উৎপত্তি, প্রধানতঃ, গ্রামে। গ্রামে কি চেষ্টা করিলে উন্নততর উপায়ে, গম হইতে ময়দা, ধান্য হইতে তণ্ডুল, সর্ষপ বা তিল হইতে তৈল, কাষ্ঠ হইতে বাক্স, সূত্র হইতে অস্তুত মোজা ও গেঞ্জি, ইত্যাদি, প্রস্তুত করিয়া, সমবেত-চেষ্টার উদ্বোধন করা চলে না? গ্রাম হইতে, কৃষকের সহযোগিতায়, কি নগরের বড় বড় কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের প্রত্যক্ষ-ভাবে বন্দোবস্ত করা চলে না? নীতি-জ্ঞান, রাসায়নিক-জ্ঞান, বিনিময়ের সুব্যবস্থা, নূতন শিল্পের বা নূতন প্রণালীতে শিল্পের প্রবর্ত্তন, কৃষি-বাণিজ্যাদিতে সমবায়, স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধান, চিকিৎসার বন্দোবস্ত ইত্যাদি, শিক্ষিত-সমাজ দূরে অবস্থান করিলে, গ্রামে কোথা হইতে আসিবে? ইহাতে নিজের ও অপরের, উভয়েরই লাভ। ইহাতে কাহারও, প্রতিপক্ষ সাজিয়া, দেশকে সঙ্কটোন্মুখ করিয়া তোলার প্রয়োজন দেখা যায় না। চাই, উদ্যোগ ও সম্মিলন, চাই, আত্ম-শক্তির জাগরণ ও সকলের সহানুভূতি-লাভ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রোগ ও তাহার প্রতীকার।

আজ পনর বৎসর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, কিন্তু গৃহ-শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছি, আজ চব্বিশ বৎসর। যখন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতাম, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ পর্য্যন্ত, বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন পরিবারে, বিভিন্ন প্রকৃতির, কত ছাত্রই পড়াইলাম। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া বুঝিয়া, আজ জীবনের মধ্যভাগে যাহা উপলব্ধি করিতেছি এবং যে মীমাংসায় পৌঁছিয়াছি, আজ তাহাই স্বদেশ-বাসীর চরণে নিবেদন করিব।

বর্ত্তমানে শিক্ষা সমস্যা লইয়া অনেক গণ্যমান্য স্বনাম-ধন্য মনীষী ও মনস্তত্ত্ব-বিদ আলোচনা করিতেছেন। আজকাল আবার, "মানসিক দাসত্ব" এই কথাটি লইয়াও প্রায় সর্ব্বত্র বিপুল আন্দোলন চলিতেছে। অনেকের মতে, এই মানসিক দাসত্বের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীই প্রধানতঃ দায়ী।

যিনি যাহা বলুন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, আসল রোগটি কোথায়, এবং তার প্রতীকারের ব উপায় কি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে, প্রত্যেক উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে, অন্ততঃ তিনজন উপাধিধারী শিক্ষক রাখিতে হয়। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই, উপাধি-ধারী শিক্ষকগণের সংখ্যাই, বিদ্যালয়ের যোগ্যতার (মাপকাঠির) পরিমাপক হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আবার বি টি, এল্ টি, প্রভৃতি তাহার উপর আর একটুক রং ফলাইয়াছে। কেহ যেন মনে করিবেন না, ইহাদের প্রতিকূলে কিছু বলাই আমাদের অভিপ্রায়। তা আদৌ নয়। B T, L T-গণ যে (বিশেষত মেয়েদের মধ্যে যাহারা B T বা L T হন, তাহারা) অধিকাংশ স্থলেই অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, সে কথা আমরা বিশেষরূপেই জানি। কিন্তু তথাপিও রোগ যেখানে, ঔষধ সেখানে পৌছিতেছে না। যাহার উদরের পীড়া হইয়াছে, তাহার গালে প্রলেপ মাখাইলে ফললাভের সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা প্রণিধান যোগ্য। B A, M A, B T, L T, যিনি যতগুলি উপাধীধারীই হউন না কেন, যতক্ষণ তিনি ছাত্রদের সেবায় নিজকে তন্ময় করিতে না পারিবেন, যতদিন ছাত্রদের সেবাই তাহার প্রধানতম ব্রত বা তপস্যা না হইবে, ততদিন তিনি সমস্ত বিশ্বের বিদ্যার অধিকারী হইলেও, প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারিবেন না। মানুষ গড়িয়া তোলা তাঁহার কর্ম্ম নয়।

মনীষীগণ যতই নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, যতদিন শিক্ষকতৈয়ারী না হইবে, ততদিন, শত-সহস্র নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াও, তাঁহারা প্রকৃত-শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন না। দোষ, নিয়মের নয়, দোষ, শিক্ষকের। দেশের প্রধান অভাব, শিক্ষক। আমার কথা যে সত্য, তাহার সাক্ষী, প্রত্যেক অভিভাবক, তাহার সাক্ষী, প্রত্যেক ছাত্র। ডাক্তারের ত্রুটীতে,রোগীর মৃত্যু হয়, আর আমাদের কৃপায়, কতশত ছাত্রগণ যে জন্মের মত উৎসন্ন যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ছাত্রদের সঙ্গে, অধিকাংশ স্থানেই আমাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক এবং ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ প্রীতিং বিপত্তে কারণং মাং। যেই মানসিক দাসত্বের কথা তুলিয়া, আমরা বড় গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর দোষারোপ করিতেছি, সেই মানসিক দাসত্বের প্রধানতম উৎস-ই আমরা, এই শিক্ষক মহাশয়গণ। ছাত্রগণ সর্ব্বদাই আমাদের ভয়ে তটস্থ। বুঝুক, আর নাই বুঝুক, তাদের মানিয়া লইতেই হইবে যে, তাহারা বুঝিয়াছে এবং মন সায় না দিলেও, প্রাণের ভয়ে, মুখ সায় দিতে বাধ্য। তাহাদের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই, দাঁড়াইয়া 'আমি নির্দ্দোষ', একথা বলিবার অধিকার নাই। যেহেতু, সে ছাত্র এবং আমরা শিক্ষক। কদাচিৎ, দুই একজন মহা-প্রাণ শিক্ষক যে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই বলিতেছি। শৈশব হইতেই, শাসনের ভয়ে, ছাত্রেরা ঘাড় পাতিয়া, বিনাদোষে দোষী, বিনাপরাধে শাস্তি, সত্যবাদী হইয়া মিথ্যাবাদী, অথবা মিথ্যাবাদী হইয়া সত্যবাদী, ইত্যাদি স্বীকার করিয়া

লইতে শিখে। জীবনের উষায় তাহাবা সর্ব্বাগে এই সর্ব্বনেশে শিক্ষাই পাইয়া থাকে যে, শিক্ষক মহাশয়ের সব কথায় ঘাড় পাতিয়া বা মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া যাইতে হয়। যদি কখনও কোনও ছাত্র, দুর্ভাগ্য ক্রমে, ইহাব অন্যথাচবণ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকে কতকটা উপভোগ্য, ভুক্তভোগীরা সকলেই এক বাক্যে তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

বুঝিবার বা আয়ত্ত করিবাব শক্তি কখনই সকলের সমান থাকিতে পারে না। কিন্তু, আমাদের আইন অনুসারে, সকলকেই সমান বুঝিতে বা আয়ত্ত করিতে হইবে। বরং অধিকাংশ স্থলেই, আমরা অধিকতর মেধাবী বা শক্তিশালী ছাত্রগণকেই, সকলের শক্তিব মাপকাঠি বলিয়া ধরিয়া লই। প্রায় সকল বিষয়েই ভাল ছাত্রগণের রায়ই, আমরা উচ্চ আদালতের রায়ের মত, অম্লান-বদনে মানিয়া লই। এইরূপে, অপেক্ষাকৃত অল্প-মেধাবী বা অল্প-শক্তি বিশিষ্ট ছাত্রগণ দিন দিনই পিছাইয়া পড়িতে থাকে। তখন তাহারা ক্রমে আমাদের প্রদত্ত (অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়) idiot ইত্যাদি, শ্রুতি মধুর ইঙ্গ-বঙ্গ উপাধিতে বিভূষিত হইতে থাকে। এইরূপে দুইএক বৎসর অতিবাহিত করিবার পর, তাহারা, মা সরস্বতীর উপর ক্রমেঃ বীতরাগ হইয়া উঠে, এবং ক্রমে, তাহার পর সেলাম ঠুকিয়া সরিয়া পড়ে। এই সমস্ত 'খারাপ' ছাত্রদের উন্নতির জন্য যে কোনও শিক্ষক চেষ্টা করিয়া থাকেন, এইরূপ অপবাদের খবর প্রায়ই আমাদের শ্রুতি-গোচর হয় না। আমরা যে তৈল সিক্ত মস্তকেই তৈল-মর্দ্দন করিতে অধিক পটু, তাহা অকাট্য সত্য। যারা নিজের পায় দাঁড়াইতে পারে, অধিকাংশ স্থলেই, আমরা তাহাদেরই গায়ে একটু হাত বুলাইয়া বাহাদুরী নিয়া থাকি। যে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাকে আমরা প্রায় কোনও উৎপাত করি না, অকাতরে মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে দেই।

এ সকলেরই একমাত্র কারণ, আমরা শুধু পেটের দায়েই এই ব্যবসায়টা গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা অনেকেই ইহা আদৌ পছন্দ করি না, তবে, নানা পন্থায় বিফলে আয়ুপায় তাই এই কার্য্যেই ব্রতী থাকিয়া যাই।

একজন বড় পণ্ডিতের পুত্র আমাদের স্কুলে পড়িত। গজঃ, গজৌ, গজাঃ, দেখিয়াই যখন তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, এবং সাজা পাইবার ভয়ে, মজা করিয়া যখন সে, তাহার বিদ্যালয়ে যাইবার পথে, খাজা ও জিবে গজা কিনিয়া খাইতে লাগিল, তখন তাহার পিতা বলিলেন,—"আর পড়ে দরকার নাই, ওকে ভট্‌চার্য্যি করে দেব।"

আমরাও অনেকে সেইরূপ। যখন আর কোথায়ও কিছু করিতে পারি না, তখনই এই উদ্গীরণ-বিদ্যা বা গিলিত-চর্ব্বণের ব্যবসাটি অবলম্বন করি এবং অসংখ্য ছাত্র-মণ্ডলীর মস্তিষ্ক ভক্ষণ করি।

আমাদের দোষের কথা ত সবই প্রায় বলিলাম। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু ইহা ঠিক যে, ইহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নয়।

এখন দেখা যাক্, এ সমস্তের কারণ কি? এ সমস্তের জন্য দায়ী কে? দায়ী, আমাদের সমাজ; দায়ী, আমরা সকলেই। একটা চলিত কথা আছে, "পয়সা দিবে একটি, আর গান শুন্‌বে অক্রুর-সংবাদ।" আমাদের দেশেরও সেই অবস্থা। সর্ব্বত্রই প্রায় এই ধারণা যে,

শিক্ষকগণ বায়ুভুক্ (সর্প কিম্বা সর্পের প্রকৃতি বিশিষ্ট কিনা, কে জানে)। তাহাদের না খেলে চলে এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণেরও না খেলে চলে, শুধু তাই নয়, তাহাদের সুখ দুঃখ থাকা সম্ভব নয়. কেন না, তাহারা এই শিক্ষকতা-রূপ অপকর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছে। এই অপকর্ম্মের শাস্তি—চিৎকার ও অত্যাচার, পরিণাম, অনাহার ও হাহাকার। আর লাভ,—কর্ত্তৃপক্ষের হাতে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার এবং ছাত্র ও অভিভাবক গণের নিকট গঞ্জনা ও অপূর্ব্ব ব্যবহার।

সমাজে, শিক্ষকতা কার্যটি দিন দিনই নিন্দনীয় হইয়া দাড়াইতেছে। সম্মুখে যাহারা "ইহা অতি পবিত্র কার্য্য" ইত্যাদি বলিয়া আপ্যায়িত করেন, অন্তরালে আবার তাঁহারাই, শ্লেষ ও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, ইহাদিগকে অতীব অকর্ম্মণ্য জীব ও নিতান্ত কৃপার-পাত্র বলিয়া মনে করেন।

এখন প্রতিকারের কথা কিছু বলিব। ভাল শিক্ষক পাইতে হইলে, শিক্ষকগণের অভাব দূর করিতে হইবে মর্য্যাদা বাড়াইতে হইবে। যাহারা অপরের সন্তানগণের মঙ্গল-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন, অপর সকলে কি তাঁহাদের অভাব-মোচনের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য নন? সর্ব্বসাধারণের উচিত, যাহাতে শিক্ষকগণ অনন্য কর্ম্মা হইয়া, একান্ত মনে, শুধু তাঁহাদেরই সন্তানগণের শিক্ষা-ব্রতে, শক্তি সামর্থ্য, বিদ্যা বুদ্ধি, প্রাণ মন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা। যতদিন তাঁহারা ইহা না করিবেন, ততদিন, তাঁহাদের সন্তানগণও মানুষ হইয়া উঠিবে না। তারপর, শিক্ষা-প্রদান ও মানুষ গড়িয়া তুলিবার সফলতার উপর (শুধু উপাধি বা পাশ করাইবার শক্তির উপর নয়) শিক্ষকদের উন্নতি নির্ভর করা উচিত। সর্ব্বত্রই শিক্ষকগণের বেতন প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে, অধিকতর উপযুক্ত লোক এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবেন এবং যাহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা, অনন্য কর্ম্মা হইয়া, শুধু ছাত্রদের উন্নতির জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে পারিবেন। সমস্ত শিক্ষকই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, স্নান আহারের সময় টুকু ব্যতীত, শুধু ছাত্রদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। ছাত্রগণেরই সেবাই হবে, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। শুধু ১০টা-৪টা হাজিরা দিয়া, চাকরী-বজায় রাখিবার মত কার্য্যাদি সমাপন করিলে, হাজার শিক্ষায়তন বা শিক্ষা পরিষৎ গঠন করিলেও কিছু হইবে না; যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে, সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত রহিয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে কেন। শিক্ষায়তনই হউক আর শিক্ষা-পরিষৎই হউক, পড়াইব ত আমরাই। উৎ-যোগের হাওয়াতেই অবশ্য আমরা হঠাৎ বদলিয়া যাইব না।

তারপরের কথা। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রায় সর্ব্বত্রই, দেখাবার কর্ত্তৃপক্ষগণ থাকেন; শুধু কর্ত্তৃত্ব করবারই জন্য—শুধু প্রভুত্ব দেখানই—তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। আমরা কর্ত্তৃপক্ষ কথাটাতেই আপত্তি করি। পরিচালকগণের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, বিদ্যালয়ের উন্নতির কার্য্যে শিক্ষকগণকে নূতন নতন তথ্য-সংগ্রহ দ্বারা সাহায্য করা। প্রতি মাসেই শিক্ষক-মণ্ডলীর সঙ্গে সমবেত হইয়া, কার্য্যপ্রণালীর দোষ গুণাদির সম্যক্ বা বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া, প্রয়োজনানুসারে, তাহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা। তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ছাত্রদের সেবায়, শিক্ষকদের মত, তাঁহারাও সাহায্যকারী সেবক

মাত্র। সকলের সমবেত শক্তি দ্বারা এই সেবাকে সফল-প্রসূ করিয়া তোলাই, তাঁহাদের লক্ষ্য।

ছাত্র গড়িবার মূলমন্ত্র—প্রেম ও চরিত্র। ছাত্রদিগকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে হইবে, বন্ধুর মত তাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, তাহাদের ভুল ত্রুটির দিকে সজাগ নজর রাখিতে হইবে, প্রেমের শাসনে সকলকে বশ করিতে হইবে, ছাত্রদিগকে শাসন না করিয়া, সর্ব্বদাই নিজকে শাসন করিতে হইবে, কঠোর আত্ম পরীক্ষা প্রতি নিয়তই চালাইতে হইবে, প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয়েরই শত শত ছাত্র-রূপী পরীক্ষক যে সর্ব্বদা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অনুসন্ধিৎসু চক্ষুগুলি যে শুধু তাঁহারই দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শিক্ষকগণ মাত্র দুটি চক্ষুর সাহায্যে যখন ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন ছাত্রের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করেন, সেই সময়েই যে ষাট্, আশী বা শত চক্ষু, তাঁহারই কার্য্য প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছে, একথা প্রতি মুহূর্ত্তে মনে জাগরূক থাকিলে অধিকাংশ শিক্ষকই অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

আজ কালের ছেলেরা কিছুই নয়, একেবারে অপদার্থ, ইত্যাদি, কথা প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের মুখেই শোনা যায়। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমরাই (আমি ই হই বা অপর কেহ-ই হউন) তাহাদের অপদার্থ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আমাদেরই করিতে হইবে। এসব স্থলে, তিরস্কারের বা শাসনের পরিবর্ত্তে, সহানুভূতি, এবং বিশেষভাবে পৃথক সাহায্য, কল্পনাতীত সুফল প্রদান করিয়াছে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

তারপর প্রায় সকল বিদ্যালয়েই, শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত খাটানো হইয়া থাকে। উপরওয়ালাগণ শিক্ষকগণের এতটুকু অবকাশও সহ্য করিতে পারেন না। লৌহ-নির্ম্মিত কলগুলিরও বিশ্রামের দরকার হয়, একমাত্র শিক্ষকগণেরই বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কলেজের অধ্যাপকগণের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু হতভাগ্য শিক্ষকগণের নাকি কিছুতেই ক্লান্তি আসে না। প্রায় কোনও বিদ্যালয়েই শিক্ষকগণ একাধিক পিরিয়ড্ (period) অবকাশ পান না। এই পিরিয়ড্ জিনিষটা কোথায়ও, কোনও বিদ্যালয়ে, ৫৫, কোথায়ও ৫০, আবার কোথায়ও বা, ৪৫ মিনিট মাত্র। ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন ছাত্রের পড়া শোনা লইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে যে কি কষ্ট এবং কাজটা কতদূর অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিবার মত লোক দেশে আছে বলিয়া, আমাদের বড় বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেকটি ছাত্রের অভিযোগ ইত্যাদি শুনিয়া, প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না, এমন শিক্ষক দুর্ল্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মুখে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, কিন্তু ছোট ছাত্রদিগকে পড়াইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে ত আমরা প্রায় কোনও বিদ্যালয়েই দেখিলাম না। সর্ব্বত্রই, যাহাদের সাহায্য করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন, তাহাদেরেই আমরা অধিকতর অবহেলা করিয়া থাকি। প্রায় সর্ব্বত্রই, অল্প বেতনের অল্প শিক্ষিত শিক্ষকগণের দ্বারা, নিম্নতম শ্রেণী গুলির কার্য্য সম্পাদন করান হয়। শুনিলে অবাক্ হইবেন, অধিক শিক্ষিত মহোদয়গণ, ঐ সকল শ্রেণীতে আরও অধিকতর অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা বড় বড় বিষয় আলোচনা করার দরুণ, ছোট খাটো ছেলেদের শিক্ষাদান-রূপ নিষ্ফল-কার্য্যে তাঁহারা প্রায়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন।

পোলাও, কোর্ম্মা, ইত্যাদি যাঁহাদের নিত্য ভক্ষ্য—শুক্তানি, চচ্চরী, ইত্যাদি অখাদ্য নাকি তাঁদের প্রায়ই পছন্দ হয় না। আমাদের মতে, উপাধিধারী হউন আর না-ই হউন, সুশিক্ষিত, সুমিষ্ট-ভাষী, ধীর স্থির, সৌম্য-মূর্ত্তি, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, উৎসাহী লোকই নীচের শ্রেণীগুলির পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। অবশ্য উপরোক্ত গুণগুলি, প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যেই বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ছোট ছেলেদের শ্রেণীতে এগুলি আরও অধিক আবশ্যক। আজকাল দেখা যায়, কোনও শিক্ষকই প্রায় নীচের শ্রেণীতে পড়াইতে রাজি হন না। তাহার কারণ এই যে, নীচের শ্রেণীতে পড়াইলে, কতকটা মর্য্যাদার লাঘব হয়, উন্নতির আশা থাকে না, এবং উপর ওয়ালাগণ, তাঁহাদের পরিশ্রম বা সফলতার কথা প্রায় আমলেই আনেন্ না। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক বলিয়া তাঁহারা বিদ্যালয়ে, সহকর্ম্মীদের নিকটে এবং সাধারণের কাছেও অনেকটা অনাদৃত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শিক্ষকতা-কার্য্যের সফলতা, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। টোট্‌কা ঔষধের ন্যায়, যিনি যত পাশ করাইবার মত, ছুটো সহজ উপায় শিখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই ততটা ভাল শিক্ষক। কিন্তু, প্রকৃত-শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানুষ গড়িয়া তোলা, তাহা আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত—সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা যে, ছাত্রের বিশেষত্ব কোথায়, যে ছাত্রটীর যেখানে বিশেষত্ব, তাহাকে সেখানে ফুটিয়া উঠিতে বিশেষরূপে সাহায্য করা। প্রত্যেক ছাত্রের 'ধাত্' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করা ও যাহাতে তাহা সম্যক বিকাশের সুযোগ পায় তাহা করাই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। কত সময় আমরা দেখিয়াছি, যে ছাত্রটিকে আমরা নেহাৎ 'নিরেট' মনে করিতাম (অর্থাৎ, যে অঙ্ক-শাস্ত্রে বুৎপন্ন নয় বা ইংরাজী-ব্যাকরণ দেখিলে 'ভ্যা'করণ করিয়া থাকে) সে ছাত্রটির হয়ত চিত্র-বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা। একপস্থলে, তাহাকে নির্য্যাতিত না করিয়া, শিক্ষকের উচিত হয়, উৎসাহ-প্রদান করিয়া, তাহার ঐ শক্তিটির উন্মেষ সাধন করা। রোগ চিনিতে না পারিলে যেমন চিকিৎসা করা যায় না, ছাত্রের 'ধাত' বুঝিতে না পারিলে, তেমনি ছাত্রকে শিক্ষা-দান করা যায় না।

আমাদের মতে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষককে, সর্ব্ব-নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষা-কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত। প্রত্যেক শিক্ষকেরই, একটি শ্রেণী পড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে বা পরে, বিশ্রামের সময় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই সময় তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ ছাত্রদের অভাবের কথাই চিন্তা করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা উপর ওয়ালাদের একটা কর্ত্তব্য-কার্য্য হওয়া উচিত।

প্রতি সপ্তাহে, অভাব পক্ষে প্রতি মাসে, প্রত্যেক শ্রেণীস্থ ছাত্রদের উপযোগী, অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতির সাহায্যে, পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের জন্য, যথাক্রমে ৫৫।৫০।৪৫।৪০ ইত্যাদি মিনিট সময়-বিভাগে রাখা উচিত। যতই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে থাকে, ততই ছাত্রগণ এবং শিক্ষকগণ যে অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে থাকেন, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

উপসংহারে সংক্ষেপে এই বলিতে চাই, ছাত্রগণের জন্য শিক্ষকগণই দায়ী এবং শিক্ষকগণের

জন্য সমাজ দায়ী। শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে চাই, শিক্ষক। তারপর চাই, অর্থ। সেই অর্থ রাজাই দিন, আর দেশের সদাশয় মহাত্মাগণই দিন, অথবা ছাত্রগণের অভিভাবকগণই দিন। স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজন, প্রকৃত শিক্ষক। বেশী নয়, দশ বার জন উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করুন, দেখিবেন ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বাড়ীতে যাইতে চাহিবে না, তাহারা নূতন মানুষ হইয়া, আপনা আপনিই গড়িয়া উঠিবে।

শিক্ষা-বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার আছে। সুযোগ ও সুবিধা হইলে, ভবিষ্যতে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীভরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মহাভারত মঞ্জরী

সভাপর্ব্ব।

পঞ্চম অধ্যায়। মগধরাজ জরাসন্ধ।

দেবর্ষি নারদ বীণায় যে ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন তাহা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণে বাত্রিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি সভা দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "এখন তোমার রাজসূয় যজ্ঞ করা উচিত।" সেই কথা যুধিষ্ঠির মনে অহরহ জাগিতেছে। কিন্তু তিনি প্রিয় বন্ধু কৃষ্ণের মত না লইয়া, এত বড় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এ জন্য তিনি দ্বারকায় দূত ও রথ পাঠাইলেন। কৃষ্ণ অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। প্রিয় সম্ভাষণাদির পর রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কৃষ্ণ, রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কেবল ইচ্ছাতেই কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। আমার আত্মীয়-স্বজন তাহাতে ব্রতী হইতে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কেহ কেহ আত্মীয়তার অনুরোধে, দোষ প্রদর্শন না করিয়া, পরামর্শ দেন, কেহ আবার যাহা বলিলে প্রভু সন্তুষ্ট হন, শুধু তাহাই বলেন. অন্যে আবার নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরামর্শ দেন। তুমি কাম ক্রোধের অতীত, সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ-বর্জ্জিত, আবার এই মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে সকলই জান। যাহা শুভকর, বল। আমি তোমার মত অনুসারেই কার্য্য করিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজন্, আপনি সর্ব্বগুণের আধার? এজন্য এইরূপ যজ্ঞ আপনারই শোভা পায়। কিন্তু যিনি সম্রাট্, একমাত্র তিনিই রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে অধিকারী। আপনি ত সম্রাট্ নহেন। মগধাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধ বাহুবলে অন্য নরপতিকে পরাজিত করিয়া সম্রাট্ হইয়াছেন। মহাবল শিশুপাল তাহার সেনাপতি। বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত রাজ্যের প্রবল নরপতিগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত (১)। শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন আরও বহু ভূপতি তাঁহার সহায়। কত রাজা, জরাসন্ধের অত্যাচার উৎপীড়নে ভীত হইয়া, আপন আপন রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, প্রাণের প্রিয়তম পৈতৃক মথুরানগরী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী দ্বারকায় আশ্রয় লইয়াছি। (২) এই নরাধম ছিয়াশী নরপতিকে স্বীয় গিরিদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আর চৌদ্দটা নরপতিকে বন্দী করিতে পারিলেই, শঙ্করের নিকট শত নরবলী দিবেন। এই পাপ কার্য্যে যিনি বাধা প্রদান করিবেন,

---

(১) সভাপর্ব্ব ১৪—২০। (২) সভাপর্ব্ব ১৪—৬৭।